Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata / Ashok Sen, 98 S. P. Mukherjee Rd.; Kolkata:700028	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 1, No.1, *Sravana*, 1363 B.S (1956) – Year 4, No. 3 - 12, 1367 B.S. (1960).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: O.K. / Good. Cover page of *Sundaram* 2nd yr, no. 3 is partially torn.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

নন্দন

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

সম্পাদক

সুভো ঠাকুর

লেখক

হুমায়ুন কবির

অশোক মিত্র

গ্রন্থকীট

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আশু চট্টোপাধ্যায়

মালবী ঠাকুর

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বনাথ চৌধুরী

পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অসীম সোম

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

রঘুনাথ গোস্বামী

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য

একটাকা

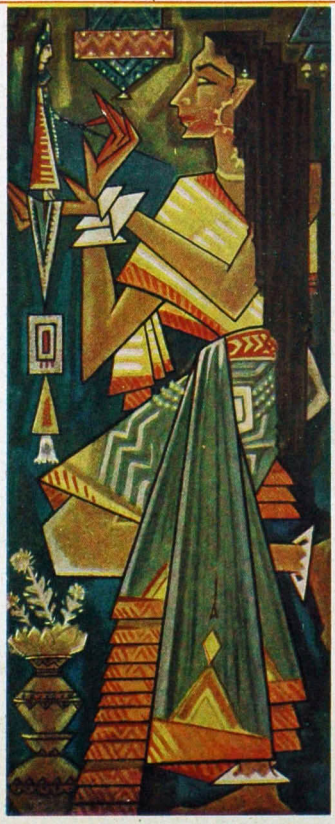

। ভাগ্যদেবী : শিল্পী সুভো ঠাকুর ।

সুন্দরম্

প্রথম বর্ষ

পৌষ—জ্যৈষ্ঠ ▒ ষষ্ঠ—একাদশ

তেরোশো তেষট্টি—চৌষট্টি

। এই সংখ্যার সূচীপত্র।

সম্পাদকীয়। লেখক—সুভো ঠাকুর। পৃষ্ঠা—তিনশো পঞ্চান্ন

বাংলার সাংস্কৃতিক সংকট। লেখক—হুমায়ুন কবির। পৃষ্ঠা—তিনশো উনষাট

প্রত্যাখ্যাত প্রতিকৃতি। লেখক—দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি। পৃষ্ঠা—তিনশো পঁয়ষট্টি

চিত্রে রসবিচার। লেখক—অশোক মিত্র। পৃষ্ঠা—তিনশো সাতষট্টি

গ্রন্থজগৎ। লেখক—গ্রন্থকীট। পৃষ্ঠা—তিনশো তিয়াত্তর

ভারতীয় প্রাচীন চিত্রপ্রসঙ্গে। লেখক—অধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠা—তিনশো পঁচাত্তোর

চুভিন। লেখক—আশু চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা—তিনশো বিরাশি

শিল্পী সুনয়নী দেবী। লেখক—মালবী ঠাকুর। পৃষ্ঠা—তিনশো পঁচাশি

আমিনা আহমেদ। লেখক—কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত। পৃষ্ঠা—তিনশো তিরানব্বই

শিল্পী সুধা মুখার্জি। লেখক—বিশ্বনাথ চৌধুরী। পৃষ্ঠা—তিনশো নিরানব্বই

বাউল। লেখক—পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা—চারশো সাত

চলচ্চিত্র। লেখক—অসীম সোম। পৃষ্ঠা—চারশো বোলো

প্রদর্শনী পরিক্রমা। লেখক—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা—চারশো কুড়ি

কমলা চৌধুরী। লেখক—রঘুনাথ গোস্বামী। পৃষ্ঠা—চারশো পঁচিশ

প্রচার-শিল্পী অর্চনা সেন। লেখক—নিজস্ব প্রতিনিধি। পৃষ্ঠা—চারশো সাতাশ

শিল্পী শিলা অডেন। লেখক—অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃষ্ঠা—চারশো তেত্রিশ

হৈমন্তী সেন। লেখক—বিশেষ প্রতিনিধি। পৃষ্ঠা—চারশো পঁয়ত্রিশ

পরবর্তী সংখ্যা থেকে নিয়মিত ইংরিজি মাসের পয়লা সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। সুন্দরমে প্রকাশকে সময়ানুগ করার জন্যেই এবারের এই ব্যবস্থা। পূর্ব প্রতিশ্রুতি ও নিয়মানুযায়ী অবশ্য আমাদের বার্ষিক গ্রাহকগণ দশটি খণ্ড এবং ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণ পাঁচটি খণ্ড পাবেন।

লেখক পরিচয়

হুমায়ুন কবির কবি। প্রাবন্ধিক। কথাশিল্পী। শিক্ষাবিদ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

অশোক মিত্র শিল্প সম্পর্কিত প্রবন্ধকার। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ শিল্প, বাণিজ্য ও সমবায় দপ্তরের সচিব।

অর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক। গ্রন্থকার।

আশু চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যিক। গ্রন্থকার।

মালবী ঠাকুর শিল্পোৎসাহী। সুলেখিকা।

কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত তরুণ কবি। প্রাবন্ধিক। গ্রন্থকার।

বিশ্বনাথ চৌধুরী সাহিত্যিক। চারু ও কারুকলা সম্পর্কে উৎসাহী।

পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পী। সংগীতেও উৎসাহ আছে। বাংলার বাউল ও সাঁওতালদের নিয়ে বহু ছবি এঁকেছেন।

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় নানা সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রচারবিদ।

রঘুনাথ গোস্বামী শিল্পী। সুলেখক। একটি প্রচার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

অসীম সোম চলচ্চিত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধকার। প্রচারবিদ্। শিল্পোৎসাহী।

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আভ্যন্তরিক অলংকরণ অর্থাৎ 'ইন্টিরিয়ার ডেকোরেশন' সম্পর্কে সুইজারল্যাণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত। শিল্পানুরাগী।

লেখা ও লেখক সম্পর্কে। খ্যাত অখ্যাত তরুণ প্রবীণ নির্বিশেষে সকলের লেখাই প্রকাশে আমরা আগ্রহশীল। শিল্পী এবং শিল্প সম্পর্কে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প আমরা গ্রহণ করি। অনুলিপি রেখে লেখা পাঠাবার অনুরোধ করা হচ্ছে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।

এজেন্টদের সম্পর্কে। এজেন্টদের কমিশন শতকরা পঁচিশ টাকা দেওয়া হয়। পাঁচ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। মফঃস্বলের সোল-এজেন্সির জন্যে পঞ্চাশ কপি নিতে হবে। অগ্রিম মূল্য ছাড়া পত্রিকা পাঠানো সম্ভব নয়।

গ্রাহকদের সম্পর্কে। প্রত্যেক কপি পোষ্টাল সার্টিফিকেটে পাঠানো হয়। সুতরাং কপি না পেলে পোষ্ট অফিসে খোঁজ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের পক্ষে পুনরায় কপি পাঠানো অসম্ভব। বার্ষিক মূল্যঃ সডাক বারো টাকা আট আনা ষাণ্মাসিক মূল্যঃ সডাক সাত টাকা আট আনা।

পত্রিকা সম্পর্কে। বিনামূল্যে নমুনাগুও দেওয়া হয়না। সাধারণ সংখ্যার জন্যে সডাক এক টাকা চার আনা এবং বিশেষ সংখ্যার জন্যে সডাক আড়াই টাকা পাঠাতে হয়। রেজিষ্ট্রী খরচ স্বতন্ত্র।

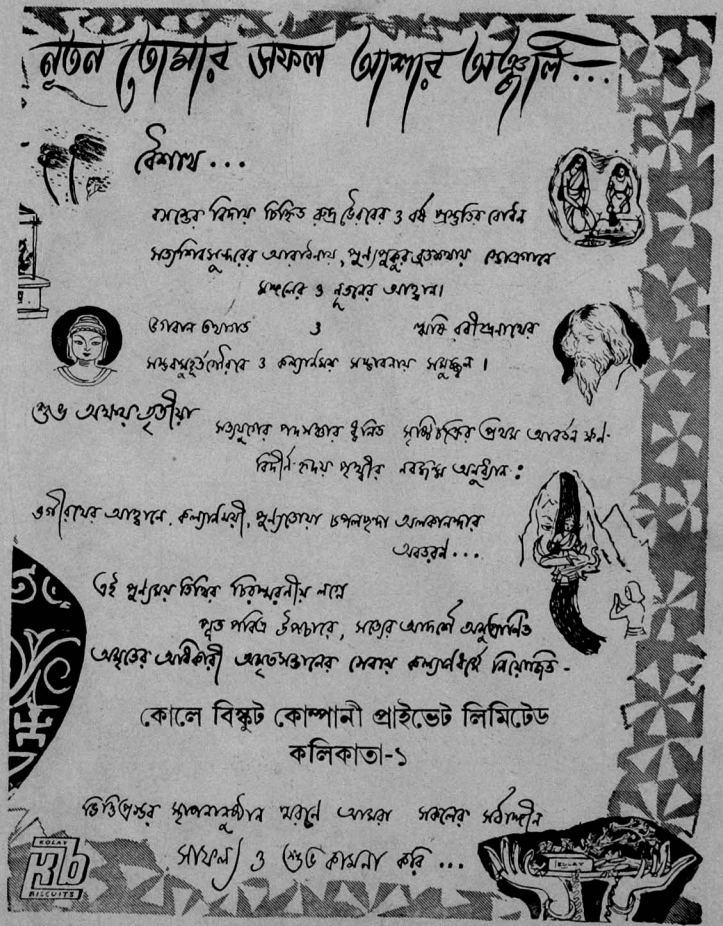

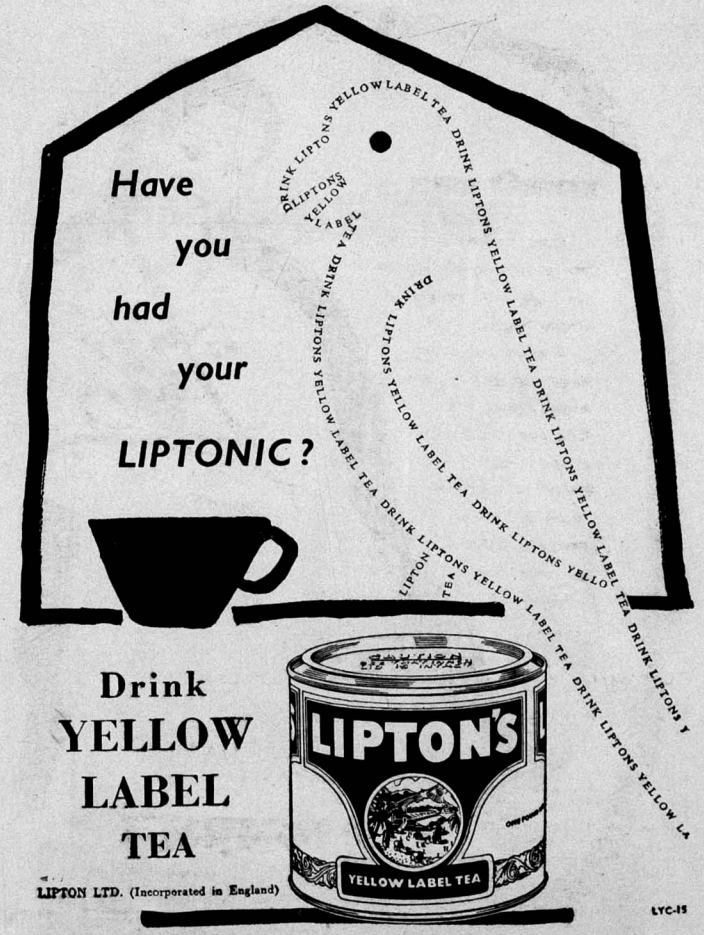

কেশবতী কন্যা ...
চাঁদের সুষমা-মাখা তা'র মুখ, বিজলীপ্রভা তা'র দেহবল্লরী, আর কেশ? কেশ তা'র ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জের লীলায়িত বিন্যাস।
রূপরচনায় কেশের স্থান গুরুত্বপূর্ণ, রূপকল্পনায় পাই তারই আভাস। কে না চায় নিবিড়-কালো কেশকলাপ? কে না চায় তা'কে ধ'রে রাখতে চিরদিন? এই চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে সেতুবন্ধ **কেশরঞ্জন**, যার ভেষজগুণ শুধু অপর্যাপ্তই নয়, অনন্যসুলভও বটে।
কেশরঞ্জন
অসাধারণ কেশতৈল
কবিরাজ এন, এন, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিঃ কলিকাতা-১

Have you had your LIPTONIC?
DRINK LIPTONS YELLOW LABEL TEA
Drink YELLOW LABEL TEA
LIPTON'S
YELLOW LABEL TEA
LIPTON LTD. (Incorporated in England)
LYC-15

বাংলার কারুশিল্প

বাংলার হস্তশিল্প চারুকলার অপূর্ব নিদর্শন। ন্যায়সঙ্গত দর বা'লে তার কদরও হওয়া উচিত ঘরে ঘরে। এসব জিনিষ শুধু যে সংগ্রহশালার গৌরব বৃদ্ধি করে তা নয়, গৃহের সৌন্দর্য ও সকলের আনন্দ বর্দ্ধনেও এর তুলনা নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

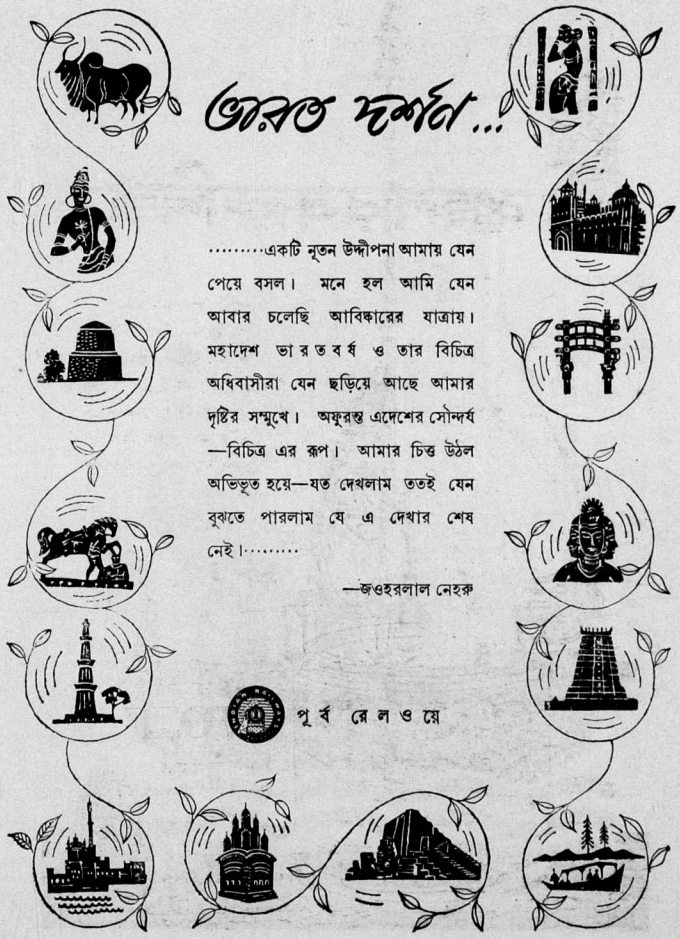

ভারত দর্শন...

.....একটি নূতন উদ্দীপনা আমায় যেন পেয়ে বসল। মনে হল আমি যেন আবার চলেছি আবিষ্কারের যাত্রায়। মহাদেশ ভারতবর্ষ ও তার বিচিত্র অধিবাসীরা যেন ছড়িয়ে আছে আমার দৃষ্টির সম্মুখে। অফুরন্ত এদেশের সৌন্দর্য —বিচিত্র এর রূপ। আমার চিত্ত উঠল অভিভূত হয়ে—যত দেখলাম ততই যেন বুঝতে পারলাম যে এ দেখার শেষ নেই।.....

—জওহরলাল নেহরু

পূর্ব রেলওয়ে

থার্মোপিলির বিস্ময়

খৃষ্টজন্মের ৪৮০ বছর আগেকার কথা। পারস্যের দুর্দান্ত সম্রাট জেরেক্সেজ গ্রীসদেশ আক্রমণ করেছেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে ছিল একদল ভারতীয় তীরন্দাজ। এই তীরন্দাজরা সুদূর ভারতবর্ষ থেকে সঙ্গে এনেছিল এক নতুন অস্ত্র—ইস্পাতের ফলা লাগানো তীর। থার্মোপিলির রণক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ গ্রীকবাহিনী এই নতুন অস্ত্রের মুখে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। যুদ্ধে তাদের হার হল। ইতিহাসে আজও তার প্রমাণ রয়েছে।

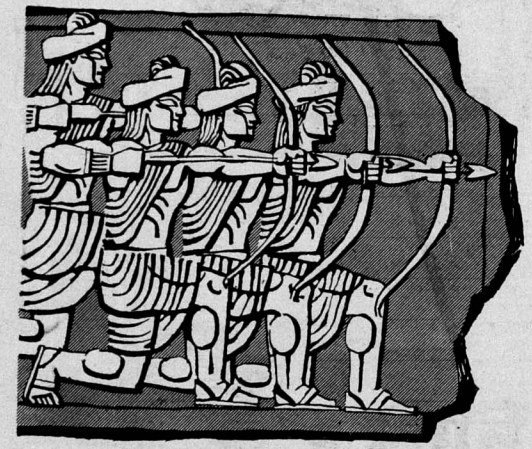

আজ, আবার জাতীয় পরিকল্পনার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে ইস্পাত—কিন্তু তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতে ইস্পাতের উৎপাদন দ্রুত বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে—যুদ্ধের প্রয়োজনে নয়, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য।

টাটা স্টীল দেশের সেবায় নিরত

TN 1042

দীপ্তি লণ্ঠন কখনও খারাপ হয় না আর এর ব্যবহারে ২০ ভাগ কেরোসীন খরচ কম হয়। এই লণ্ঠন গঠনে মজবুত আর দেখতে সুন্দর।

আরো আলো

ভারতের জীবন স্পন্দিত হয় তার গ্রামে। দুশো বছরেরও বেশী এই গ্রামগুলি অজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবে ছিল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আজ এই অন্ধকার ক্রমশঃ বিদূরিত হচ্ছে। এই উৎসবমুখর দিনগুলিতে 'দীপ্তি' শুধু আপনার গৃহই আলোকিত করবে না আপনার মনেও এনে দেবে নূতন আলো।

দীপ্তি

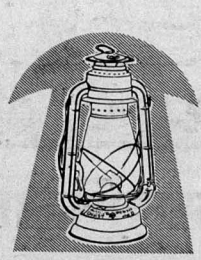

লক্ষ লক্ষ গৃহ আলোকিত করে

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

হেড অফিস: ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফ্যাক্টরী: আগড়পাড়া এষ্টেট

একটি

আরামদায়ক

উপহার...

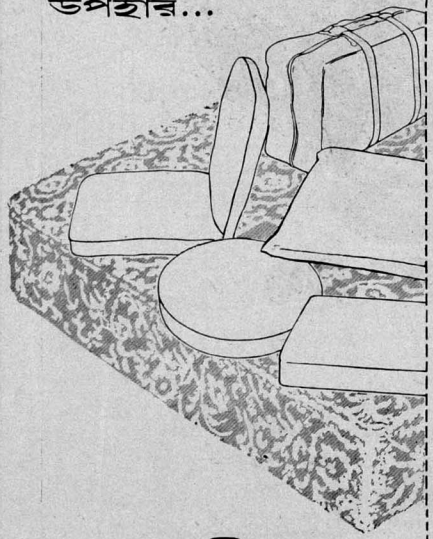

ডানলপিলো

রবারের ফেনা জমিয়ে তৈরি—

সর্বপ্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট

গড়ে মানুষের আয়ু ষাট বছর ধরলে, হিসেব করে দেখা যাবে তার জীবনের প্রায় আঠারো বছরই কাটে ঘুমিয়ে; চোদ্দ বছর কাজকর্মে, পাঁচ বছর ভ্রমণে, চার বছর পড়াশোনায়, পাঁচবছর খাওয়াদাওয়ায়, আর বছর তিনেক হয়তো কাটে রোগশয্যায়। বাকি সময়টা অবসর বিনোদন, আড্ডা ইত্যাদি। জুতার ফিতে বাঁধতেই মাস ছয়েক কেটে যায়। ডানলপিলোতে শুয়ে বসে এসব কিছুই আরো অনেক আরামে করা চলে—এজন্য ডানলপিলো সকলেই পছন্দ করবে। উপহার হিসেবে ডানলপিলো একটি চমৎকার জিনিস।

ওয়াড় সমেত বালিশ	চেয়ারের গদি
পিঠে দেবার গদি	তোষক ও বালিশ সমেত 'ট্রাভেলিং কিট'
মোটর গাড়ির দোলিং গদি	

DPC-84 BEN

রূপ চর্চায় অপরিহার্য

সৌন্দর্য সাধনায় উৎকৃষ্ট প্রসাধন দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন সম্মত। বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত বেঙ্গল কেমিক্যালের তিনটি নূতন শ্রেষ্ঠ প্রসাধনী আপনার রূপ ও লাবণ্য উজ্জ্বলতর ক'রবে।

প্রিয়া স্নো

ত্বক কোমল ও নির্মল রাখে

উষসী

ফেস পাউডার

অভিজাত প্রসাধন রেণু

প্রিয়া সেন্ট

অনবদ্য পুষ্পসার

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা * বোম্বাই * কানপুর

ছুটিতে **দার্জিলিঙ**

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স প্লেনে যান

কলিকাতা থেকে বাগডোগরা

(রোজ সকালে ও বিকেলে সার্ভিস)

ছুটির দিনগুলি অমূল্য—যাতায়াতে যত কম সময় লাগে ততই ভালো। আই-এ-সি প্লেনে যান—দু'ঘন্টারও কমে পরম আরামে পাহাড়ী অঞ্চলে পৌঁছে যাবেন। কলকাতা থেকে এক কদমে বাগডোগরা। সেখান থেকে মনোরম মোটরপথে দার্জিলিঙ—যার জলবায়ু তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের মতোই আশ্চর্য। খেলাধুলোয় মহানন্দে সময় কাটান—ঘোড়ায় চড়ুন, ঘোড়দৌড়ে যান, মৎস্য কিম্বা পক্ষী শিকারে মেতে থাকুন।

আপনি যদি দিল্লী কিম্বা বম্বেবাসী হন—দমদম থেকে তৎপর বাগডোগরার প্লেন পাবেন। ফিরতিপথে বাগডোগরা থেকে সকালের প্লেনেই সুবিধে—প্রাতরাশের পরই দার্জিলিঙ ত্যাগ, তারপর নৈশভোজনের পূর্বেই দিল্লী প্রত্যাগমন।

ছাত্রদের জন্য কম ভাড়ার ব্যবস্থা আছে।

অনুসন্ধান বা রিজার্ভেশনের জন্য এই ঠিকানা—

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স করপোরেশন

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা
ফোন: ২৩-৫১৪১ (৬ লাইন)

PSI 3

সিনিগোল্ড জুয়েলারি স্পেশালিষ্ট

মৌলিকতায়
নির্ভরতায়
আধুনিকতায়

ফোন: ৩৪-১৭৬১ • গ্রাম: ব্রিলিয়ান্টস

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

১৬৭/সি, ১৬৭সি/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ব্রাঞ্চ: বালিগঞ্জ

২০০/২/সি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯, ফোন: ৪৬-৪৪৬৬

শোরুমের পুরাতন ঠিকানা

১২৪, ১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(কেবল মাত্র রবিবার খোলা থাকে)

নতুন ব্রাঞ্চ শোরুম—জামসেদপুর, ফোন: জামসেদপুর—৮৫৮

সমবায়জাত তাঁত বস্ত্রের বিপুল ও অভিনব সমাবেশ

ধনেখালি, রাজবলহাট, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর, ফুলিয়া, দেবীপুর, সিউড়ী, বাঁকুড়া প্রভৃতি বিভিন্ন সমবায় কেন্দ্রের নানাবিধ সুন্দর পছন্দসই ধুতি, সাড়ী, বিছানার চাদর, গামছা ইত্যাদি বাজার অপেক্ষা অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। কারণ, এসকল দ্রব্য এই কেন্দ্রীয় সমবায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ও সদস্য শ্রেণীভুক্ত সমবায় ইউনিয়নের ও সমবায়ী তাঁতিগণ কর্তৃক প্রস্তুত। সমবায়জাত অন্যান্য সর্ব্ববিধ বস্ত্রাদির সরবরাহ করাও সমিতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের উভয়বিধ ব্যবস্থাই আছে।

সমিতির খুচরা বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন সদস্য সমবায় সমিতিসমূহ প্রত্যেক জেলায়, সহরে ও গঞ্জে জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছে—সমবায়জাত তাঁতের কাপড় ক্রয় করার দ্বারা কেবল দেশের কুটীরশিল্পের উন্নতিতে সাহায্য নয়, ফলে সহস্র সহস্র তাঁতি পরিবারে সুখ ও শান্তি স্থাপন করা হয়।

তন্তুজ কাপড় কিনুন

তাঁতের কাপড় কেনার সময় 'তন্তুজ'ই চাইবেন। বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ এই কাপড় আপনাদের জন্য তৈরী করেছেন

ওয়েষ্ট বেঙ্গল উইভার্স কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

১০নং, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

"তন্তুজ" কাপড়ের একটি প্রদর্শনী ৫ই মে থেকে ১২ই মে পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত্রি ৯টা অবধি খোলা থাকবে

স্থান : **১৬।৩, গড়িয়াহাট রোড** (গড়িয়াহাট রোড ও একডালিয়া রোডের মোড়)

ঝড়ের আকাশ—বিশ্বনাথ চৌধুরী

(উপন্যাস)

প্রকাশক—**প্রদীপ পাবলিশার্স ৩২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২**

দাম—**দুইটাকা**

বিজ্ঞাপনের বিশেষণে নয়—সমালোচকের ভাষায়

"মনদেয়া-নেয়া কাহিনী কখনো পুরাতন হয় না, সাহিত্যে উপন্যাসের আকর্ষণ হয়তো এই কারণেই অপরাজেয়। ঝড়ের আকাশ বইখানি বৃহৎ উপন্যাস না হইলেও এই ছোট উপন্যাসের কাহিনীটি এমন সুসংবদ্ধ, সুন্দর ও সুলিখিত যে ইহাতে পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট না করিয়া পারেনা। বর্ত্তমান যুগ ও জীবনের ইহা একখানি চমৎকার আলেখ্য। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কাহিনী এই উপন্যাসখানির প্রধান বিষয়বস্তু হইলেও পল্লীর অতীত ঐশ্বর্য্যের চিত্র হইতে বর্ত্তমান নাগরিক সভ্যতার পরিবেশে কয়েকটি উচ্চশিক্ষিত নরনারীর হৃদয়াবেগের গতি, প্রকৃতি ও পরিণতি এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে যাহার আবেদন শাশ্বত ও ঘটনার আবর্ত্তন অবিস্মরনীয়, সর্বোপরি নর-নারীর প্রেম বা প্রণয় সাধনা যে ঐশ্বর্য্য সমুদ্রের বহুউর্দ্ধে অবস্থিত, এই উপন্যাসের নায়ক জয়ন্ত ও নায়িকা কৃষ্ণার জীবনে সেই সত্যই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্র চিত্রনে গ্রন্থকার যে কিরূপ সিদ্ধহস্ত, তাহা তাহার আদিনাথ, ইন্দুনিভা হেমলতা, রমলা, অশোক, বিকাশ, মন্দিরা প্রতিমা প্রভৃতি ছোট বড় সকল চরিত্রেই সুস্পষ্ট।

কাহিনী কৌতূহলে, ঘটনা বৈচিত্র্যে, সরস লিপিকুশলতায় ও মানবমনের গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উপন্যাসখানি সবদিক দিয়াই উপভোগ্য।"

—যুগান্তর—২৮।৪।৫৭

BRITISH PAINTS LIMITED
ENCOMPASS THE WORLD

★ ENGLAND
★ SCOTLAND
★ IRELAND
★ AMERICA
★ AUSTRALIA
★ SOUTH AFRICA
★ CANADA
★ TRINIDAD
★ INDIA

BRITISH PAINTS
(INDIA) LIMITED

IN THE SERVICE OF INDIA

PSAE-1

PSAE-11

বিশিষ্টদের মধ্যে একজন
অথবা বহুর মধ্যে একজন ?

গৃহ সৌন্দর্য সচেতন প্রত্যেক মহিলাই তাঁর গৃহকে সাধারণভাবে পরিষ্কার রাখবার জন্য প্রত্যহই দৃষ্টি দেন। কিন্তু নিয়মিত ব্রাসো ব্যবহারের যত্ন নেন কেবলমাত্র সেই বিশিষ্ট কয়েকজন গৃহকর্ত্রীই যাঁরা এর ব্যবহারের তফাৎটা বুঝতে পেরেছেন।

আপনি কবে আপনার গৃহের তামা ও পিতলের জিনিসপত্রাদি শেষবার পালিশ করেছেন ? গতকাল ? গত সপ্তাহে ? অথবা গতমাসে ?

আপনি কি বহুর মধ্যে একজন অথবা বিশিষ্টদের মধ্যে একজন ?

নিয়মিতরূপে ও ঘন ঘন ব্রাসো ব্যবহার করুন।

ব্রাসো
মেটাল পালিশ
আপনার গৃহের উজ্জ্বলতা বাড়ায়

সোনারং বালুরাশি,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ,
অনন্ত বেলাভূমি,
আর
মহিমান্বিত মন্দির
··· এ সবই তো
পুরীর আকর্ষণ।
কিন্তু
পুরীতে
দক্ষিণ-পূর্ব
রেলওয়ে হোটেলে
থাকার মতো
মনোরম বোধহয়
আর কিছু
নেই।

চমৎকার আহার্য ও বাড়ীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হোটেল

নীল দিগন্তে
তরঙ্গায়িত পাহাড়,
উপত্যকার
প্রান্তে প্রান্তে
প্রকৃতির
আরণ্য সৌন্দর্য,
হুড্রু নির্ঝর ও
মনোরম
আবহাওয়ার
জন্যই রাঁচির খ্যাতি।
আর দক্ষিণ-পূর্ব
রেলওয়ে হোটেলের
চমৎকার আহার্য
ও স্বাচ্ছন্দ্যও রাঁচিকে
কম খ্যাতিমান
করেনি।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের পাবলিক্ রিলেসন্স্ অফিসার কর্তৃক প্রচারিত

SER/PA/A

A treasure TO KEEP

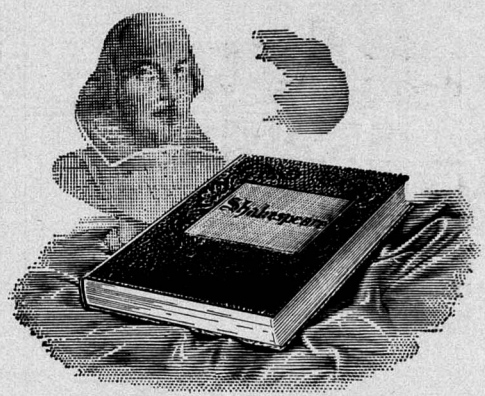

A pleasure TO SMOKE

Wills's The "Three Castles"

TC/129

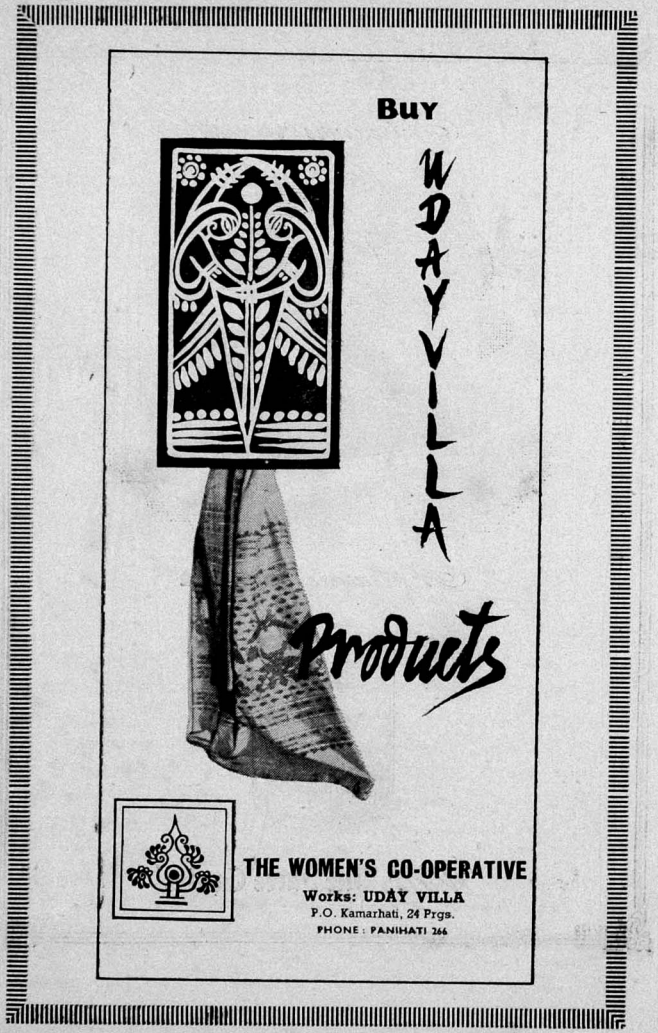

সুন্দরম্। ষষ্ঠ—একাদশ সংখ্যা। প্রথম বর্ষ। পৌষ—জ্যৈষ্ঠ। তেরশো তেষট্টি—চৌষট্টি।

সম্পাদকীয়

সুভো ঠাকুর ওর ঘর থেকে রাস্তার ধারের বড় জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো :—পদ-পথের এপার-ওপার ল্যাম্পপোস্টের শীর্ষদেশে দড়িতে বাঁধা বিগত নির্বাচন অথবা ইলেকশান-এর ছেঁড়া প্রচারপত্রগুলো চৈত্রের ঝাপ্‌টা হাওয়ায় সকরুণ মর্মরধ্বনিসহ তখনও ফর্‌ফর্ কোরে উড়ছে।

আহা, সেইসব প্রচারপত্র এই তো কয়েকদিন আগেও কত না ছিল জীবন্ত! দেশের সব রথী-মহারথীদের প্রতিচ্ছবিসহ কত না কীর্তি ছিল তাতে প্রচারিত। সেই সব প্রতিকৃতির নিদারুণ কলা-নিদর্শন কত না আশার বাণী প্রকাশ কোরতে সক্ষম হোয়েছিল একদা। কিন্তু আজ সেই ছবিগুলির কোনটির বা মুণ্ডদেশ, কোনটির বা ধড়দেশ ছিঁড়ে চৈত্রের ঘূর্ণিবাত্যায় শুষ্ক ঝরাপাতার মতো কোথায় উড়ে চলে গেছে।

সুনীতি নয়, দুর্নীতি নয়, অথচ তাদেরই মতো আর এক নীতি হোচ্ছে এই রাজনীতি, যা সুনীতি না হোলেও, দুর্নীতি না হোলেও অবশ্যই বিশেষরূপ আর একটা কিছু যে নীতি এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই বিশেষ নীতির সঙ্গে নির্ঘাত এ যুগের নাড়ীর অনাহত যোগাযোগ অবিসম্বাদী। অবশ্য অশিক্ষিত-পটু সরল সুভো ঠাকুরের কাছে রাজনীতি, নীতি হিসাবে যেমন বিচিত্র তেমনি বিস্ময়কর! ও অবাক হোয়ে অনুধাবন করে—এই

রাজনীতির বিশেষ নীতির কৃপায় নির্বাচনের অথবা ইলেকশান-এর আওতায় রাতারাতি কত অক্ষম ছাগশিশু সিংহরূপে পরিবর্তিত। কোলকাতার পথে-ঘাটে আজও যারা বক্ষ স্ফীত কোরে নিরীহ নাচার পথচারীদের পথ-নির্দেশক হিসাবে সগৌরবে বিরাজিত। সেই সঙ্গে আবার একথাও স্বীকার্য যে শহরের তথাকথিত সক্ষম সিংহ শাবকরাও অকর্মণ্য ছাগশিশুরূপে রূপান্তরিত হোয়ে হতাশায় পথে পথে অতীত গৌরবের তৃণ চর্বণান্তে পরিভ্রমণকারী।

এই রাজনীতির পক্ষপুষ্ট নির্বাচনের দৌলতে একধারে যেমন অন্যান্য নীতির বালাই বর্জিত কত না ব্যক্তির ললাটে গৌরবের গদীতে আসীন হওয়ার ভাবী আমন্ত্রণ, তেমনি আবার অন্যধারে নির্বাচনপ্রার্থী কত না নীতিপরায়ণ সাধু ব্যক্তির এমন কি অর্থ ইস্তক বাজেয়াপ্ত। এই রাজনৈতিক দলাদলির দালালিতে কত অপদার্থ অর্বাচীন হাজার হাজার ভোটে বিজয়ী বালকবীর! যেখানে হয়তো সত্যপরায়ণ আদর্শবাদী অভিজ্ঞ নিঃস্বার্থ কর্মীর মাথা ভোটযুদ্ধের পরাভবের গ্লানিতে ভারাক্রান্ত ও নিতান্তই অবনত।

সুভো ঠাকুরের চোখের পর্দায় তখন চলচ্চিত্রের ন্যায় সামন্ততন্ত্র থেকে সাধারণতন্ত্র অবধি ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে এধার ওধার কোরতে থাকে। মানুষের সব কিছু আদর্শ, বৃহত্তর কল্পনা এমন কি বিরাট ব্যক্তিবিশেষের মহতী ব্যক্তিত্বও দেখা যায় কার্য উদ্ধারের অছিলায় অনাচার অসত্যের জবরদস্তিতে পর্যুদস্ত ও পদদলিত। নির্বাচনের বৃহত্তর নীতি, আদর্শ, সব কিছুই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চরম সাধনায় ভেঙে ভেসে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হোয়ে যায়। তবে ওর মতে এর ব্যতিক্রম হিসাবে এবারে বিশেষভাবে মৌলানা আজাদের নামই উল্লেখ্য। রাজনীতির নীতি অনুযায়ী এবারের নির্বাচনে ন্যায়ত যদি কেউ জয়ী হোয়ে থাকেন তবে তা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-ই বটে। তাঁর নির্বাচনী এলাকা অথবা কনস্টিটিউএন্‌সিতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার পূর্বাহ্ণ অবধি কদাচ ভোটভিক্ষার্থে পদার্পণ করেননি তিনি।—ছলা-কলার আশ্রয়গ্রহণ তো দূরের কথা! অথচ জাতিধর্মনির্বিশেষে লক্ষাধিক ভোটদাতার বিপুল বিশ্বাস তাঁর প্রতি অর্পিত হোয়ে, সত্য কথা বলতে কি, এই রাজনৈতিক বামনাবতারের যুগে তাঁকে নিঃসন্দেহেই বিরাটাকার কোরে তুলেছে।

এক্ষণে সুন্দরমের সৌন্দর্যাশ্রয়ী পাঠক-পাঠিকাদের চিত্তের এ জিজ্ঞাসা সহজেই অনুমেয় যে, সুন্দরমের পক্ষে রাজনীতি তথা নির্বাচন উপলক্ষে দৌরাত্ম্যের মতো এত উপমার উপঢৌকন বা বর্ণনার বাহাদুরি কি কারণে? সত্যি কথাই বটে! এই কলাবিষয়ক পত্রিকার পক্ষে রাজনীতির আলোচনায় তেমনতর তাৎপর্য কিছু না থাকলেও সুভো ঠাকুর বলে—সভ্য মানুষের অথবা মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির একটি বিশেষ স্মারকচিহ্ন হিসাবে যে গণতন্ত্র, সেই গণতন্ত্রের স্বাধীন চিত্ত একমাত্র এই নির্বাচন মারফতেই তো প্রতিফলিত। সেই হিসেবে শিল্পীরাও যে এর কেবলমাত্র অংশগ্রহণকারী শুধু তাই নয়, তাদের মনের উপরও এই নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। কলা বিষয়ক পত্রিকা সুন্দরমে এই কারণেই নির্বাচন অথবা ইলেকশান সম্পর্কে এই আলোচনার অবতারণা।

যাই হোক, পথের এপার হোতে ওপার জুড়ে দড়িতে বাঁধা নির্বাচনের স-চিত্র ও অ-চিত্র ঐসব প্রচারপত্রগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে হতাহত সৈনিকের ন্যায় চারিধারে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ছড়ানো। তাদের এইরূপ পরিণতির উপর স-আক্ষেপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণান্তে, শ্মশান-বৈরাগ্যে বিপর্যস্ত-মানস সুভো ঠাকুর এবার শিল্পজগতের অন্যান্য ঘটনাবলীর দিকে, তাঁর নৈর্ব্যক্তিক আলোচনার মোড় ঘোরায়।

ও বলে—ষড় ঋতুর মধ্যে কবিরা যেমন বেছে নিয়েছে বসন্তকালকে, তেমনি শীতকালকে বেছে নিয়েছে আমাদের দেশের শিল্পীরা। শীতকাল আর যে কোন সৃজনীপ্রতিভার পক্ষে অরুচির উদ্রেক করুক, শিল্পীদের পক্ষে এটি নিঃসন্দেহে একটি মৌসুমী কাল। বছরের বিশেষ মাসে বিয়ের লগন লাগার মতোই এই সময়টিতে প্রদর্শনীর লগন লাগে। সারা ভারত জুড়ে এই সময়টিতে প্রদর্শনী উন্মোচনের চলে একান্ত উত্তেজনা। মাসের পর মাস কত শিল্প-প্রতিভা প্রতীক্ষায় বুড়ো আঙুলে ভর কোরে দাঁড়িয়ে থাকে এই শুভ সময়টির আগমনীর উদ্দেশ্যে। শিল্পীদের একক এবং গোষ্ঠীগত চিত্রের অগণিত প্রদর্শনীর সুরু হয় এই সময়ে। এর মধ্যে আবার কত শিল্পীর প্রদর্শনী করার আশা অচিরাৎ আশাভঙ্গে পর্যবসিত হয় উপযুক্ত স্থানের অভাবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে কোলকাতার মতো একটি বিরাট

সহরে, যেখানে অসংখ্য ক্ষমতাপন্ন শিল্পীর সহজিয়া আবির্ভাব, সেখানে প্রদর্শনীর একটি স্থায়ী আস্তানার জন্য অহরহ আক্ষেপ সর্বজনবিদিত। বম্বেতে বিখ্যাত কলা-পৃষ্ঠপোষক স্যার কাওয়াস্‌জি জাহাঙ্গীরের বদান্যতায় শিল্পীদের প্রদর্শনীর উপযুক্ত হর্ম্য অথবা হল্ বর্তমান। দিল্লীতে আর্টস এণ্ড ক্রাফট্‌স সোসাইটির হর্ম্য সেখানকার প্রদর্শনী উন্মোচনের ব্যবস্থাপনায় অনেকাংশেই অভাব মোচনে সক্ষম। এমতাবস্থায় কোলকাতায় প্রদর্শনীর উপযুক্ত একটিও প্রদর্শনীশালা নেই কি কারণে, এ জিজ্ঞাসা কি একান্তই অবান্তর?

এ ব্যাপারে দেশজ শিল্পীবৃন্দ সমবেতভাবে সুন্দরম্ মারফৎ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় এবং তাঁর অধীনস্থ শিক্ষা-দপ্তরের সুদক্ষ সচিব ডাঃ ডি, এম, সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরছে। শ্রদ্ধেয় ডাঃ রায়ের বাংলাদেশের হিতচিন্তা ও গৌরববৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তবু কেন যে এযাবৎকাল বাংলাদেশে, গোষ্ঠীনির্বিশেষে শিল্পীদের ব্যবহার-উপযুক্ত একটিও প্রদর্শনী-প্রকোষ্ঠ অথবা হর্ম্য নির্মাণ সম্ভবপর হলো না, তা বোঝা নিতান্ত দুরূহ। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যদি কিছু পরিকল্পনা থেকে থাকে তবে তা সর্বসাধারণের গোচরার্থে খবরের কাগজ মারফৎ ঘোষিত হোলে দেশবাসী অনিবার্য আনন্দ লাভ কোরবে।

বোলতে গেলে বাংলাদেশের সব গৌরবই প্রায় একে একে অপহৃত। কেবলমাত্র কলা ও কৃষ্টির ব্যাপারে যৎকিঞ্চিৎ প্রাণশক্তি আজও বহুবিধ বাধা ও বিঘ্নসংকুলতার মধ্যেও অপঘাতে অবলুপ্ত হয়নি। তবে দেখা যায়—সেই কলাকৃষ্টিরও একটি শান্তিপূর্ণ সমাধি অথবা সমাধানের শনৈঃ শনৈঃ সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বা সম্ভব হোতে চলেছে। এর শুভ ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হোতে স্পষ্টতর। শোনা যায়, কোলকাতার প্রত্নতত্ত্বাগারের অথবা মিউজিয়মের ললিতকলা বিভাগ—দিল্লী দরবারে স্থানান্তরিত করা রূপ মহাসম্মান দানের প্রস্তাবনা। কোলকাতা সহরে এই প্রত্নতত্ত্বাগারে যা কিছু সাধারণ গৌড়ীয় মর্তাবাসীদের আনন্দবর্ধনে সক্ষম ছিল, যা কিছু তত্ত্বানুসন্ধানের দরুণ দর্শনীয় হিসেবে তাদের আগ্রহ আকর্ষণে আকর্ষণীয় ছিল তা সবই না কি ইন্দ্রপুরীর উপযুক্ততম আবহাওয়ায় উপস্থাপিত করার চলেছে প্রচ্ছন্ন আয়োজন। গৌড়জনের এর চেয়ে মহাগৌরব আর কি হোতে পারে? বাংলাদেশের দেহে বিজাতীয় আমলে যে সম্মানলাভ সম্ভব হয়নি, নিরপেক্ষ জাতীয় সরকার সততই দিল্লী দরবারের দ্বারদেশে পদার্পণ কোরতে না কোরতে তা একে একে সম্পূর্ণ কোরেছেন। এরপর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের নিত্য নতুন উন্নতির আরও কত কি চলেছে আয়োজন। পাঠশালা উন্নতির পরিকল্পনার সাথে সাথে এই বঙ্গদেশের নানা অপার উন্নতির জল্পনা-কল্পনা যেন পাল্লা দিয়ে চলেছে। ইন্দ্রপ্রস্থ তথা ইন্দ্রপুরী হোতে প্রেরিত অহরহ অগণিত সেইরূপ শুভেচ্ছাপূর্ণ পরিকল্পনার সুশীতল প্রলেপ নিয়তই যেমন প্রাণস্পর্শী তেমনি বেদনাহরক। দিল্লীর সেই কেন্দ্রীয় সরকারের দাক্ষিণ্যে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস আজ ধন্য ধন্য রবে প্রতিধ্বনিত।

এরপর সুভো ঠাকুরের একমাত্র গুরুদেবের কথাই স্মরণ হয়। একদা গুরুদেবের মুখনিঃসৃত যে বাণী ওকে বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন আশায় উদ্বেলিত কোরে তুলেছিলো—সে কথা ওর মনে পড়ে।

গুরুদেব বোলেছিলেন: দিল্লী কেবল রাজধানী দিল্লীই নয়, দিল্লী একালের বৃন্দাবন সমতুল্য। বৃন্দাবনে পুণ্যলোভার্থী তীর্থযাত্রীরা পদার্পণ কোরলে তাদের জীবনের একান্ত প্রিয়তম একটি বস্তু দেবতার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসার রীতি যেমন প্রাচীন, তেমনি গূঢ়তত্ত্ব সম্বলিত। যথা, ধরা যাক কোন খাদ্যলোভী তীর্থযাত্রী পরমান্ন অথবা মিষ্টান্ন ভক্ষণে একান্ত আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও বৃন্দাবনে তীর্থগমনের পর হয়তো প্রতিজ্ঞা কোরলেন ইহজীবনে তাঁর অতি প্রিয় সেই পরমান্ন অথবা মিষ্টান্ন আর কদাচ স্পর্শ কোরবেন না তিনি। দেবতার উদ্দেশ্যে সেই পুণ্যতীর্থ বৃন্দাবনে তিনি তা উপহার হিসেবেই রেখে গেলেন। সেইরূপ দিল্লী অর্থাৎ ইন্দ্রপুরী তথা ঐ নব-বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে ঐরূপ এক একটি প্রিয়তম বস্তুর উপহার দিয়ে আসা আঞ্চলিক সরকারদের কর্তব্য হিসেবে অবশ্য পালনীয় নয় কি? অন্ততপক্ষে নব-বৃন্দাবনের লীলা-সহচরদের তা আশা কোরে যদি ইঙ্গিত তথা প্রচ্ছন্ন দাবীই কোরে থাকেন তাতে অন্যায় অথবা আপত্তিটা কোথায়? পুরাতন প্রথার পুনঃপ্রচলন অর্থাৎ অতীত ভারতবর্ষের আদর্শপথে আগুয়ান হওয়াই বর্তমান ভারতের অলিখিত নীতি। আপাতদৃষ্টিতে এ ব্যাপারে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর

পদাঙ্কসরণে বাংলাদেশই যে সর্বপ্রথম অগ্রণী হবে একথা নিঃসন্দেহ।

'মেরেছো কলসীর কানা, তাই বোলে কি প্রেম দেবো না'—বৈষ্ণবী বাংলার এই চিরন্তন সুরের গুঞ্জরণ আজ তাই বুঝি দক্ষিণ সমীরণে দপ্তরের ফাইলে ফাইলে দফায় দফায় বিস্তারিত।

জয়তু বাংলাদেশ!—জয়তু বাংলাদেশের কৈবল্যপ্রাপ্ত আধুনিক নেতৃবৃন্দ! ঐ সকল নেতাদের নির্বিকল্প নেতৃত্বে এ ব্যাপারে আজ যে ঔদার্য সে দেখাতে উদ্যত হোয়েছে, সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসকল সে ঔদার্যের কণামাত্র মহিমা কদাচ, দেখানো তো দূরের কথা, অনুভব করতেও সক্ষম হবে কি?

বাংলার সাংস্কৃতিক সংকট

হুমায়ুন কবির

আজকাল বহু লোকের মুখেই সভ্যতা বা সংস্কৃতির সংকটের কথা শোনা যায়। সারা পৃথিবীতেই এরকম সংকটের রব ওঠে কিন্তু বাংলাদেশে বোধ হয় এ ধরনের আলোচনা অন্য দেশের চেয়েও বেশি ব্যাপক। তার অবশ্য কতগুলি কারণও রয়েছে। গত কুড়ি পঁচিশ বছরের মধ্যে পরপর যে ভাগ্যবিপর্যয় বাংলাদেশের উপর এসেছে তার ফলে বাঙালী স্বভাবতঃই অতীতের কথা বেশি কোরে মনে কোরতে সুরু কোরেছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে সর্বদেশে সর্বযুগেই মানুষ অতীতের কথা স্মরণ কোরে খেদ করে, ভবিষ্যতের সোনালী স্বপনকে আরো উজ্জ্বল কোরে দেখে। ইতিহাসে সাহিত্যে বারবার আমরা দেখি যে আজ যে সব যুগকে গৌরবময় মনে করা হয়, সে যুগের মানুষরাও সমকালীন সমাজে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকটের কথা চিন্তা কোরে, বিব্রত, উদ্বিগ্ন ও কখনো কখনো হতাশ হোয়ে পড়েছে। সংকটের ভয়-ভাবনা মানুষ কোনদিন এড়াতে পারেনি, বোধ হয় কোনদিন এড়াতে পারবেও না।

বস্তুতপক্ষে সংকট বোলতে আমরা কি বুঝি সে কথা খোলসা কোরে না বোললে সভ্যতা বা সংস্কৃতির সংকটের আলোচনা ব্যর্থ হোতে বাধ্য। এক অর্থে জীবনের অর্থই সংকট। যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন নিত্যনূতন সমস্যার উদ্ভব হবে এবং তাদের সমাধান কোরতে হবে। সে অর্থে মৃত্যু ভিন্ন সংকট এড়াবার আর কোন উপায় নাই। জীবনের অর্থ ই পরিবর্তন, এবং পরিবর্তনের ফল যে বর্তমানের খানিক অংশ বর্জন কোরতে হবে, খানিক অংশকে নতুন পরিস্থিতির প্রয়োজনে নতুন উপাদানের খাদ মিশিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই যে অদল-বদল, তার মধ্যে যেটুকু বর্জন কোরতে হবে, তার জন্য মনে খেদ আসবেই। যা নতুন, তাকে সকলে সমান উৎসাহ বা আগ্রহে গ্রহণ কোরবে না। সেজন্যও দুঃখ-ভাবনা খানিক থাকবেই।

সত্যিকারের সংকট তখুনি আসে যখন কোন সভ্যতা বা সংস্কৃতির সম্মুখে এরকম সহজ ও স্বাভাবিক পরিবর্তনের রাস্তা বন্ধ হোয়ে যায়। যদি এমন পরিবেশ গড়ে ওঠে যে পুরানো ধারাকে সম্পূর্ণ বর্জন, কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে তার একেবারে বিপরীত পক্ষে না যেয়ে উপায় নাই, তখন

সে অবস্থাকে সংকট বোললে অন্যায় হবে না। কিন্তু সে অর্থে বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংকট ঘটেছে একথা কি বলা চলে? ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতন বাংলার সংস্কৃতি বহু যুগে বহু বিভিন্ন ধারাকে আত্মসাৎ কোরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। প্রবীণতম কালের প্রাক-আর্য সভ্যতায় লাগল আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির ছোঁয়াচ। পূর্ব এবং উত্তরপূর্ব থেকে এসেছে নানা মঙ্গোলীয় আচার পদ্ধতি বিশ্বাসের আভাস। পশ্চিম থেকে এল প্রথমে বৈদিক ধর্মের জোয়ার এবং পরবর্তী কালে বৌদ্ধ জৈন নব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তরঙ্গপ্রবাহ। মধ্যযুগে প্রধানত সেই পথেই এসেছে ইসলামের প্রবল বন্যা এবং তার ফলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক নব রূপান্তর। ইসলাম কিন্তু বাংলাদেশে কেবল পশ্চিম থেকে স্থলপথেই আসেনি। সমুদ্রপথেও এসেছিল আরব নাবিক, সওদাগর ও ধর্মপ্রচারকের দল। স্থল-পথে যারা এসেছিল তারা প্রধানত পাঠান-তুর্কী নও-মুসলিম বোলে তাদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মের জোর-জবরদস্তিও দেখা যায়। জলপথে যারা এসেছিল তারা আরবসভ্যতার উত্তরাধিকারী। রাজশক্তি নিয়ে তারা আসেনি, এসেছে প্রধানত বাণিজ্যের তাগিদে, তাই তাদের প্রচারণায় শক্তির চেয়ে যুক্তি ছিল বেশি প্রবল। এই দুই ধারার সংমিশ্রণে গড়ে উঠল বাংলার মুসলমান-সমাজ এবং আরবী প্রভাব কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবলতর বোলে তারা এদেশের সংস্কৃতির ভিত্তিতে মধ্যযুগের বাংলাদেশে এক নতুন সংস্কৃতি-সমন্বয় স্থাপন কোরেছিল। ভালো কোরে এই সংস্কৃতি দানা বাঁধবার আগেই সুরু হলো ইয়োরোপের অভিযান। প্রথম দিকে দেখা দিল পর্তুগীজ জলদস্যু। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজের আবির্ভাবে যে আলোড়ন সুরু হলো, পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজের বিজয়ে তার সাময়িক ক্ষান্তি ঘটল। ভারতবর্ষের মাটিতে ইয়োরোপের সভ্যতার অঙ্কুর বাংলাদেশেই প্রথম দেখা দেয় এবং এখানেই সে সভ্যতার প্রভাব সব চেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যখন সুরু হলো, সে বিদ্রোহের প্রথম প্রভাবও বাংলাদেশেই দেখা দিল।

ইতিহাসের এই পশ্চাৎপট স্মরণ রাখলে বাংলাদেশে সংস্কৃতির সংকট নিয়ে ভাবনার বেশি প্রয়োজন নেই। বারংবার নতুনের আহ্বানে বাঙালীর প্রাণ-মন সাড়া দিয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে আবেগ দিয়ে নতুন সমস্যার নতুন সমাধান খুঁজেছে। সাম্প্রতিক যে সমস্ত বিঘ্ন বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে, পুরাতন বহু বিপদের তুলনায় তাদের বেশি মারাত্মক মনে করা চলে না। তবু যে বাঙালী আজ সময় সময় হতাশ মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়, তার কারণ খুঁজে দেখা প্রয়োজন।

বিগত একশো দেড়শো বছরের ইতিহাসের মধ্যে বাঙালীর বর্তমানের মনোভঙ্গের প্রথম কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের সীমান্তে। গত দু হাজার বছরের ইতিহাসে তাই বাংলাদেশ কখনো ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থান অধিকার করেনি। মৌর্য রাজত্ব-কালে পাটলিপুত্র ভারতবর্ষের রাজধানী হোয়েছিল। সেযুগে বাংলার প্রাধান্য ও সম্পদ বেড়ে গিয়েছিল একথাও সত্য কিন্তু তবু ভারতবর্ষের ইতিহাস পশ্চিমের দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। বহু দিনের বিস্মৃতির পরে আজকাল আবার আমরা শিখেছি যে এককালে ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকেও সমুদ্রপারে অভিযান চলেছে। শ্যাম, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, কম্বোজে ভারতীয় সভ্যতার ছায়া এখনো প্রসারিত। কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে প্রাচীনকাল থেকে মোগল আমলের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্ত-দেশই রয়ে গেছে।

ইংরেজের আবির্ভাবের পরে এ-অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটল। পলাশীর যুদ্ধের অল্পকাল পরে থেকে প্রায় দেড়শত বৎসর কোলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী। রাজধানীর লোকের যে সমস্ত স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা সেগুলি বাঙালীরাই পুরোমাত্রায় ভোগ কোরল। শুধু তাই নয়। ইয়োরোপীয় শিক্ষা, ইয়োরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গী, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি যখন ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল, তখন বাঙালীই বহুক্ষেত্রে সে নতুন সভ্যতার ধারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বয়ে নিয়ে গিয়েছে। তার ফলে কেবল পার্থিব ও সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি ছাড়াও মানসিক ও চিন্তাজগতের নেতৃত্ব বাঙালীর

হাতে ধরা দিলো। বহুদিন ধরে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার ফলে বাঙালীর মধ্যে অনেকের মনে এ-ধারণা বদ্ধমূল হোয়ে গেল যে ভারত-বর্ষের রঙ্গভূমিতে সর্ববিষয়েই নেতৃত্ব তার। ভারতবর্ষের শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষার প্রসার, সামাজিক প্রগতি ও রাজনৈতিক চেতনা সকলের মূলেই বাঙালীর বিশেষ দান ছিল। বর্তমান শতকের গোড়ায় গোখ্‌লে একবার বোলেছিলেন, বাংলাদেশ আজ যা ভাবে, সারা ভারতবর্ষ আগামীকাল তাই ভাববে। সে উক্তি সে কালে অনেকখানি সত্যও ছিল। কিন্তু ঘটনার পরম্পরায় যখন তার যাথার্থ্য কমে এল, তখন বাঙালী সেই কথার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে রইল।

কালক্রমে ইংরেজিশিক্ষা যখন সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ল, তখন বাঙালীর নেতৃত্বের ভাগীও নানান অঞ্চলে দেখা দিলো। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ইয়োরোপীয় শিক্ষার সংঘাতেই ভারতবর্ষে নতুন জাগরণ এসেছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলাফলের হিসাবে ইংরেজ শাসনে আমাদের যতই ক্ষতি হোয়ে থাক না কেন, চিন্তা ও ভাবনার রাজ্যে, জাতির নবজীবনের উন্মেষে আমরা ইংরেজের কাছে নানা-বিষয়ে ঋণী। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান যে বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল, তারই ফলে ভারতের নবজাগরণের সুরু। সঙ্গে সঙ্গেই ইয়োরোপীয় সুধীবৃন্দের সাধনার ফলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের গৌরব বহুল পরিমাণে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়। একদিকে পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার, অন্যদিকে বিজ্ঞানের প্রভাবে স্বাধীন চিন্তার প্রচলন—এই দুই ধারার সম্মিলনেই ভারতবর্ষের নবজীবন সম্ভব হোয়েছে। বাঙালীই প্রথম এই দুই ধারাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ কোরেছিল, বাংলাদেশেই সবচেয়ে দীর্ঘকাল সবচেয়ে বেশি মানুষ তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাই ভারতবর্ষে নবজাগরণের প্রথম যুগে বিশেষভাবে বাঙালীর কৃতিত্ব। পরে যখন সমস্ত দেশে সে জাগরণের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল—একথাও মনে রাখতে হবে যে সেই প্রসারণের কাজেও বাঙালীর দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—তখন বাঙালীর বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতৃত্বও সমস্ত ভারতবর্ষের চার-ধারে নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেলো।

এ পরিবর্তনকে বাঙালী সহজভাবে গ্রহণ কোরতে পারেনি তারও কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। এই সব কারণের দু-একটি বাংলার আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের মধ্যেই মিলবে। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি যখন বাংলাদেশে ছড়াতে সুরু কোরল, তখন ব্যাপকভাবে সমস্ত জাতির মধ্যে তার প্রসার হয়নি। চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের ফলে এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে পূর্বেই দেখা দিয়েছিল। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীই ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিকে মনে-প্রাণে গ্রহণ কোরল, কিন্তু তার ফলে দেশের আপামরসাধারণের সঙ্গে তাদের যোগ খানিকটা শিথিল হোয়ে পড়লো। শুধু তাই নয়, মধ্যবিত্তশ্রেণীর যে বিকাশ বাংলাদেশে ঘটলো, তাও অন্যদেশের তুলনায় স্বতন্ত্র। সাধারণত শিল্প বাণিজ্যের উদ্যোগের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্প্রসারণ ঘটে। বাংলাদেশে চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথার ফলে বরং শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোগের হানিই হোয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভূমিনির্ভর ও চাকুরীনির্ভর লোকের সংখ্যা অসম্ভবভাবে বেড়ে গিয়েছে। যতদিন ইংরিজি শিক্ষায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ছিল, ততদিন এ পরিণতির দোষগুলি ধরা পড়েনি। যখন চাকুরীর বাজারে বাঙালীর বহু প্রতিদ্বন্দ্বী জুটল, তখন মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবিকা অর্জনের একটি প্রধান পথ রুদ্ধ হোয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। অন্যান্য অঞ্চলে ইংরিজি শিক্ষা পরে ছড়িয়েছে। অথবা চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথার প্রবর্তন হয়নি। একক বা যুক্তভাবে এ দুটি কারণে সে সমস্ত অঞ্চলে শিল্প-বাণিজ্য উদ্যোগের ততটা হানি হয়নি। চাকুরীর ক্ষেত্র তাদের বেলায় উপার্জনের নতুন পথ খুলে দিল, কিন্তু কোন পুরাতন রাস্তা বন্ধ কোরল না। বাঙালীর বেলা তা হয়নি। যখন চাকুরীর দরজা সংকীর্ণ হোয়ে এল, সে দেখল যে শিল্পবাণিজ্য উদ্যোগের ক্ষেত্রে সে নবাগত বোলে প্রায় সকলের পিছনে হলো তার স্থান।

নতুন পরিস্থিতির সাংসারিক সুযোগ-সুবিধা আগের তুলনায় কম হোয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে এল পুরাতন সৌভাগ্যের স্মৃতির প্রতি অহেতুকী অনুরাগ। পুরাতনকে যারা আঁকড়ে ধরে থাকে, জীবন-যুদ্ধে তাদের বারেবারে পরাজয় ঘটবেই। তাই বাঙালী যখন বারবার গোখলের বাণীর পুনরাবৃত্তি সুরু কোরল, তখনই বোঝা গেল যে সংসার-যুদ্ধে তার পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ইংরেজশাসকের বিরাগভাজন হোয়ে এমনিতেই তার পথে কতগুলি নতুন বাধার সৃষ্টি হোয়েছিল—কোলকাতা থেকে দিল্লী রাজধানীর স্থানান্তর তার অন্যতম দৃষ্টান্ত মাত্র। যদি বাঙালীর নিজস্ব জীবনে ছেদ দেখা না দিত, তবে এ সমস্ত বাধাকে সে হয়তো সহজেই জয় কোরতে পারত, কিন্তু ইংরিজি শিক্ষার অসম প্রসারের ফলে সে ছেদ পূর্বেই দেখা দিয়েছিল। আগেই বোলেছি যে ইংরিজি শিক্ষা প্রধানত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং বাংলার বিগত একশো দেড়শো বছরের ইতিহাসের ফলে সে মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রধানত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় সে ছেদ দু-ভাবে দেখা দিল। তার একটি প্রকাশ তথাকথিত হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। এ সমস্যা যে প্রধানত সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় নয়, তার আসল কারণ যে অর্থ-নৈতিক, সে বিষয়ে বহু আলোচনা বহুবার কোরেছি, আজ তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় প্রকাশ শহর ও গ্রামের মধ্যে স্বার্থসংঘাত, যার ফলে সমস্ত পূর্ববাংলার ঐশ্বর্য এসে কোলকাতায় জমে উঠল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের চোখে সমস্যার এ দ্বৈতরূপ ধরা পড়েছিল এবং তিনি প্রতিকারের পথও খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যু না হোলে বোধ হয় বাংলা তথা সমস্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের মোড় ঘুরে যেত।

এ সমস্ত আভ্যন্তরীণ সংঘাতের ফলে বাংলাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হোয়ে গেল। শতাব্দীর চতুর্থ দশকে সাম্প্রদায়িক মনকষাকষি, পঞ্চম দশকের গোড়ায় মহাযুদ্ধের কালোছায়া এবং মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে মনুষ্যত্বের অবমাননার পরিসমাপ্তি ঘটল বঙ্গব্যবচ্ছেদে। এই বিভাগের ফলে স্বাধীনতার পরিপূর্ণ আনন্দ বাঙালীর মনে আসেনি। যেটুকু আশা উৎসাহ আনন্দ এসেছিল অল্পদিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ গৃহহারা নরনারীর প্লাবনে তাও মলিন হোয়ে এল। আজ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ হোতে বাস্তুহারা উৎপীড়িত জনতার বন্যাস্রোত থামেনি। তাই গত দশবৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের জন্য যে সব মহৎ চেষ্টা হোয়েছে এবং হোচ্ছে, তারও প্রভাব বাঙালীর মনকে উদ্দীপ্ত কোরে তুলতে পারেনি।

অতীতে বাঙালী নতুনের আহ্বানকে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ কোরেছে, আজও যদি তাই করে, তবেই সাম্প্রতিক বাধাবিপদের মধ্যে প্রগতির পথ খুঁজে পাবে। প্রথমেই আমাদের এ-কথা মেনে নিতে হবে যে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম আমলে ভারতবর্ষে বাঙালীর যে বিশেষ স্থান ছিল, সে স্থান ফিরবে না। সমগ্র ভারতবর্ষে সমসমাজের সৃষ্টিই আজ রাষ্ট্রের লক্ষ্য। বাঙালীকেও সেই সমসমাজে সকলের সঙ্গে সমান স্থান নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মানতে হবে যে বিশেষ কোনো সম্প্রদায় বা শ্রেণীর জন্যও কোনো বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট থাকবে না। ভারতবর্ষে যেমন বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীর সমান অধিকার আজ আমরা চাই, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যবস্থাতেই সকল বাঙালীর ঠিক তেমনি সমান অধিকার মানতে হবে। শহর ও গ্রাম, উন্নত ও অনুন্নত সম্প্রদায় এ সমস্ত পার্থক্যকেই আজ নিঃশেষে লুপ্ত কোরতে না পারলে চলবে না।

সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংগঠনে আর একটি যে গুরুতর পরিবর্তন আসছে, তাকে সচেতনভাবে গ্রহণ কোরতে হবে। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার জীবনে গ্রামের প্রভাব ছিল অধিক। ইংরেজ আমলে শহরের প্রভাব বাড়তে সুরু করে, কিন্তু আজ বঙ্গবিভাগের পরে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হোয়েছে তাতে দিন দিন নাগরিকতা আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। বস্তুতপক্ষে, পরিবর্তনের এই ধারাটিই বোধ হয় আজকের দিনে বাঙালীর পক্ষে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই গ্রামীণ সভ্যতা নাগরিক সভ্যতায় রূপান্তরিত হোচ্ছে, এবং এ রূপান্তরই বর্তমানকালে মানুষ-ইতিহাসের বোধ হয় সবচেয়ে বড় অধ্যায়। পূর্বে যে পরিবর্তন বহু যুগ ধরে অতি ধীরগতিতে সম্পন্ন হতো, আজ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তার গতি দ্রুততর হোয়েছে, এবং বাংলাদেশে সে গতির ধারা বহু দেশের তুলনায়

অধিকতর তীব্র। এ পরিবর্তনের ফলে শহর ও গ্রামের পার্থক্য কমে আসছে। গ্রামে শহরের বহু সুখসুবিধার প্রবর্তনের চেষ্টা হোচ্ছে, এবং দূরদর্শী চিন্তানায়ক ভাবতে সুরু কোরেছেন যে শহরের মধ্যেও গ্রাম্যজীবনের বরণীয় লক্ষণগুলিকে সঞ্চারিত কোরতে হবে। এখন পর্যন্ত স্রোত একরোখাই চলেছে, এবং ফলে গ্রামগুলি শহরের ছায়া হবার সাধনায় রত। কিন্তু স্রোতের মুখ যে ফিরবে, শহরের আয়তনকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা, শহরের মধ্যে প্রতিবেশ গড়বার সাধনা প্রভৃতি নানা প্রচেষ্টার মধ্যে তার আভাস মেলে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শহর ও গ্রাম জীবনের সমন্বয় সাধনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, এবং সেই সমন্বয়ের মধ্যেই বাংলার সংস্কৃতি নতুন প্রগতির পথ খুঁজে পাবে।

পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে স্বভাবতই নানা সমস্যা দেখা দেয়, জনমানসে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের বিকাশও ঘটে, কিন্তু সে পরিবর্তনের ধারা যদি ঐতিহাসিক পরম্পরার বিরোধী না হয়, তবে সংস্কৃতির সংকট ঘটবার কারণ নাই। বাংলার ইতিহাসে যুগে যুগে নতুনকে গ্রহণ করবার শক্তির পরিচয় মেলে। গত একশো দেড়শো বছরে যে-ভাবে গ্রামীণ সভ্যতা ধীরে ধীরে নাগরিকতার দিকে ঝুঁকেছে, তার মধ্যেও সে শক্তির আশ্বাস রয়েছে। বঙ্গবিভাগের ফলে পূর্বকালের কৃষিপ্রধান সমাজব্যবস্থা এমনিতেই অনুপযোগী হোয়ে উঠছিল, পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারার আগমনে সে ব্যবস্থা আজ একেবারে অচল। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কৃষি-শিল্প বাণিজ্য উদ্যোগের পরস্পরনির্ভর যে নতুন সমাজ ব্যবস্থার সম্ভাবনা বাংলাদেশে দেখা দিয়েছে, সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত কোরতে পারলে বাঙালী কেবল নিজের সমস্যা নয়, পৃথিবীর অন্যতম কঠিন সমস্যার সমাধানে সহায়তা কোরবে। বাংলাভাষার প্রতি বাঙালীর দরদ ও ভালোবাসা সর্বজনবিদিত। জনসংগঠনে বাঙালীর আভ্যন্তরীণ ঐক্যও সুস্পষ্ট। সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনে বাংলাদেশে গ্রামে ও শহরের যে চিরকালের ব্যবধান, তাও ক্ষীণ হোয়ে এসেছে। ইংলণ্ডে পাঁচ ছয়শো বছর আগে এ ধরনের আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য স্থাপিত হোয়েছিল বোলে এলিজাবেথের যুগে ইংরেজের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময়ের বস্তু হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানের সমগ্র গ্লানি ও সাময়িক আশা-ভঙ্গের মধ্যেও বাংলাদেশে আজ সেই রকম সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বোলে সাংস্কৃতিক সংকটের বদলে সেখানে সংস্কৃতির নবীন আবির্ভাব আসন্ন—এ আশা করা আমাদের পক্ষে অসংগত হবে না বোলেই বিশ্বাস।

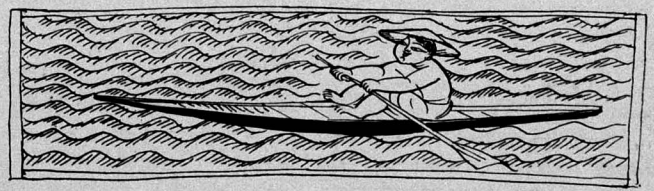

হে ভাগ্য-দেবী !
কোন্ রঙে রঞ্জিত কোরছ
তোমার হাতে রাখা
মৃঢ় মৃত্তিটিকে ?

নির্বোধ, নির্বাক ঐ জড় পদার্থটি
তোমার খুশিতে কেমন পলে পলে
রঙিন হোয়ে উঠছে।

কখনো আনন্দে
কখনো বেদনায়,
নিত্য-নতুন সে যেন ক্ষণে ক্ষণে !

না, না, দেবো না হে নিয়তি !
তোমার হাতের
খেয়ালের খেলার পুতুল হোতে
কিছুতেই দেব না আর আমি আমাকে।
আমি বিদ্রোহী,
তোমার বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহ।

তোমার খেয়ালের তুলিকে
বাধ্য কোরব বিরত হোতে।
ভাগ্যের অধিক পুরুষকারের পূজা করি আমি !

এই সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে

প্রত্যাখ্যাত প্রতিকৃতি

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি

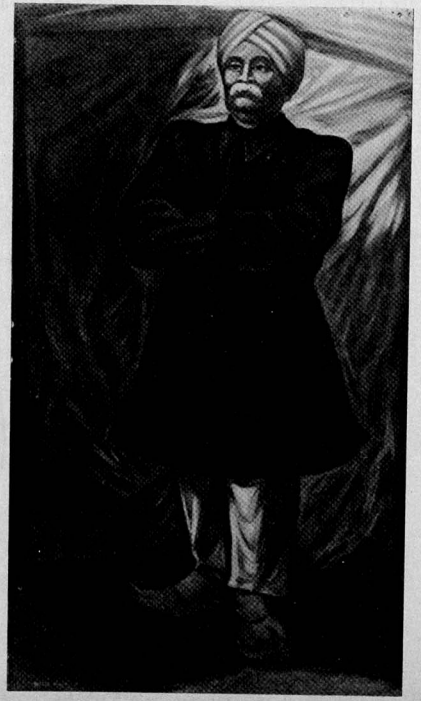

গত সংখ্যা সুন্দরম্-এর সম্পাদকীয়তে শ্রীমান সতীশ গুজরালের আঁকা প্রত্যাখ্যাত যে দেশনেতার ছবির উল্লেখ ছিল, তা হোচ্ছে পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়ের প্রতিকৃতি। এই লেখার সঙ্গে ছবিটির আলোকচিত্র পাশেই ছাপা হলো।

অধুনা দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবনে টাঙানো এই চিত্রটি কিছুকাল আগে তর্ক-বিসংবাদের তুমুল এক আলোড়ন তুলেছিল, সুন্দরম্-এ প্রকাশিত এই খবরটি অনেকেরই স্মরণে আছে। চিত্রবিচারে প্রধান প্রশ্ন হোয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রতিকৃতি চিত্রণে—চলতি ধারার ব্যতিক্রম কতখানি সমর্থনযোগ্য ? বিচারক-মণ্ডলীর বিচারে অমনোনীত এ চিত্রটি কি কোরে পার্লামেণ্টের দেওয়ালে পুনশ্চ স্থান লাভে সক্ষম হলো সে এক ভিন্ন কাহিনী। তার চেয়েও সম্ভবত বড় কথা হলো প্রতিকৃতি অঙ্কনের তথাকথিত চিত্রশৈলী বোলতে ধরা-বাঁধা যে কিছু থাকা উচিত নয় সে সত্যের স্বীকৃতি।

ছবিটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হোয়ে শিল্পী বলেন : ব্যক্তিত্বের যথাযথ পরিস্ফুটনই সবচেয়ে প্রধান গুণ হিসেবে ছবিতে গণ্য হওয়া উচিত। লালা লাজপৎ রায়ের চেহারা সামনাসামনি দেখবার সৌভাগ্য অনেকের হয়তো হয়নি। কিন্তু ছবিটিতে বিগত-দিনের সেই নেতার তেজস্বিতা, মনের দৃঢ়তা আর সাহস যদি সুষ্ঠুভাবে ফুটে উঠে থাকে তবে শিল্পসৃষ্টি হিসেবে ছবিটি সার্থক কেন হবে না, তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। শিল্পী মনে করেন যে—মানুষ লাজপৎ রায় হয়তো আগামী দিনে আরও অনেক বিস্মৃতির তলায় চাপা পড়ে যাবেন, কিন্তু অনমনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই তেজোদীপ্ত পুরুষটিকে তাঁর ছবি দেখে উত্তরসূরীরা যাতে সহজেই বুঝতে পারে, সে বৈশিষ্ট্য আরোপের চেষ্টাই মুখ্য হোয়েছে ছবিটিতে। এখানে শিল্পী তাঁর ভেতরকার আবেগ ও নিজস্ব শিল্প-চেতনার দ্বারাই চালিত হোয়েছেন, কোনও প্রচলিত মাপ-কাঠির কথা মনে রাখা প্রয়োজন বোধ করেননি। আকৃতিও এসব ছবির অন্যতম লক্ষণ বোলেই তিনি মনে করেন। যথোচিত ব্যক্তিমহিমা ও গাম্ভীর্য আনার

জন্যে দেওয়ালের পরিসর অনুযায়ী এটিকে তিনি ৭'৩" × ৪'২" আকার দিয়েছেন। তুলনায় অন্য টাঙানো একটি ছবি লম্বায় আন্দাজ মাত্র ৪ ফুট। এ ধরনের ছবি তাঁর মতে, ভাস্কর্যের মতো সাধারণ মনুষ্যাকৃতির চেয়েও বড় হওয়া উচিৎ ব্যক্তিত্বশালীর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটনের প্রয়োজনে।

শ্রীমান সতীশ গুজরালের শিল্পশিক্ষা আরম্ভ হয় অনেকটা দুর্ঘটনাক্রমে। অল্প বয়সে অসুস্থতাহেতু শ্রবণশক্তি লোপ পাওয়ায় তিনি সাধারণ পড়াশোনা বন্ধ কোরে দিয়ে শিল্পশিক্ষার দিকে ঝোঁকেন। লাহোর মেয়ো স্কুল অব আর্টে ফলিত কলা পাঠক্রম সমাপনান্তে তিনি বোম্বাইয়ে জে, জে, স্কুলে চারুকলা বিভাগে ভর্তি হন। তিন বছর সেখানে ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় আর্ট-ইন-ইণ্ডাস্ট্রির একটি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে পাঞ্জাব আর্ট স্কুলে গুজরাল ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে সে-কাজে ইস্তফা দেন। ১৯৫২ সালে একটি বৃত্তি নিয়ে মুর‍্যাল বা দেওয়ালচিত্র অঙ্কনে ব্যুৎপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে শিল্পী মেক্সিকো গমন করেন। সেদেশে সিক্যুইরো ও দ্য রিভেরার সান্নিধ্যে কাজ শেখার সুযোগ তাঁর হয়। সেখানে তাঁর একক প্রদর্শনীটি বিশেষ উচ্চ প্রশংসিত হয়। ফেরার পথে তাঁর নিউইয়র্কে অবস্থান ও একক প্রদর্শনীর আয়োজনের কথাটাও উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া দিল্লীতে তাঁর দুবার একক প্রদর্শনী হোয়ে গেছে। বোম্বাইয়ে এক যৌথ প্রচেষ্টায় তিনি অন্যতম অংশগ্রহণকারী ছিলেন। কোলকাতায় শিল্পকাজ নিয়ে যাবার বাসনা শিল্পীর রয়েছে। বর্তমানে দিল্লীর অধিবাসী, পর পর দুবছর ললিতকলা আকাদেমির পুরস্কারে সম্মানিত এই শিল্পী ফ্রি-লান্স হিসেবে অর্থাৎ কোথাও চাকরি না কোরে আপাতত তৈলচিত্র (অয়েল-পেন্টিং) ও দেওয়াল-চিত্রণ (মুর‍্যাল, ফ্রেস্কো ইত্যাদি) নিয়ে লিপ্ত থাকতে চান।

চিত্রে রসবিচার

অশোক মিত্র

ক। শিল্পে বিষয়বস্তু। * * * *

শিল্পে বিষয়বস্তু কথাটির অনেক মানে হয়। কখনও ছবির নাম বোঝায়; তাতে ছবিটি চিনতে সুবিধা হয়, কিন্তু তাতে ইস্থেটিক তাৎপর্য থাকে না। অনেক সময়ে যে দৃশ্য বা বস্তু আঁকা হোয়েছে, সেটিকে বোঝায়; শিল্পী সে সমালোচক হামেশাই এ ভুলটি করেন। তাঁদের মতে বিষয়বস্তু নিতান্তই অবান্তর, এমন কি তা যত অসুন্দর হবে ততই চিত্রের মর্যাদা বাড়বে। বিষয়বস্তু নিয়ে এরকম ভুল বোঝাবুঝি খুবই হয়, সুতরাং শিল্পে বিষয়বস্তু পদার্থটি কি তার সংজ্ঞা মনে মনে ঠিক করা দরকার।

। গান্ধার (২য় শতক) : বোধিসত্ত্ব ।

দৃশ্য বা বস্তুটি কিভাবে ব্যবহার কোরেছেন তা বোঝায় না। বিষয়বস্তু কথাটির এই ধরনের প্রয়োগ যদিও অবান্তর, তবুও অধিকাংশ লোকের কাছে দৃশ্য বা বস্তুর গুণেই ছবির মূল্য বাড়ে কমে। সাধারণ লোকের কাছে 'সুন্দর' ছবি মানেই সুন্দর দৃশ্য বা বস্তু, দৃশ্য বা বস্তু যত সুন্দর হবে, চিত্রটি ততই মহার্ঘ হবে। এই ধরনের কুসংস্কার নিয়ে বেশি আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এর প্রতিবাদে আবার ঠিক উল্টো ভুলটিও করা সম্ভব; এবং আর্টম্মন্য অনেক

যে কোন শিল্পবস্তুতে দুই ধরনের গুণ থাকে। এক ধরনের গুণকে আমরা বোলব মানবিক গুণ, অর্থাৎ বাস্তব জগতে কোন ঘটনা, দৃশ্য, বা বস্তু দেখলে আমাদের মনে যে সব ভাবের উদয় হয়, মূল্যবোধ হয়, কোন ছবি দেখলেও তার কিছুটা হয়। দ্বিতীয় ধরনের গুণকে বলব প্ল্যাস্টিক গুণ। এই গুণ থেকে যে সব মূল্যবোধ আসে তা সাধারণ জগতে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার; অর্থাৎ রং, আলোছায়া, সীমারেখা বা কণ্টর, বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে জমি বা শূন্যের

। প্যালেস্টাইন ভাস্কর্য : ৫ম শতক।

ব্যবধান, এ-সবই আমরা চারপাশের জগতে অনুভব করি। প্রথমে যে গুণগুলির উল্লেখ কোরলাম, বাস্তব জগতে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, শুধু যে শিল্পীর কাজেই তারা জন্ম নেয়, তা নয়। ফলে বাস্তব জগত আর শিল্পীর সৃষ্ট জগতের মধ্যে গোল লেগে যেতে পারে। যথা, খৃষ্টের ক্রশে আরোহণ ঘটনাটি বহু শতাব্দী আগে ঘটেছিল, তা নিয়ে কোন ছবি আঁকা হোলে সেটি হয় তার বিষয়, কিন্তু বিষয়বস্তু নয়। ভান আইক, ফ্রা আঞ্জেলিকো, গ্রিউনেভাল্‌ড্‌, তিন্তোরেত্তো, আরও বহু বহু শিল্পী সকলেই ক্রশে আরোহণ বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের ছবিতে বিষয়বস্তু সব পৃথক। ছবিতে প্রত্যেক শিল্পীই একান্ত নিজের মতো কোরে ক্যালভারিতে কি ঘটেছিল তাই ভেবেছেন, ভেবে নিজের মতো কোরে এঁকেছেন, সুতরাং একজন যে আরেকজনের দেখে আসলে কি ঘটেছিল, তখন কে কি অবস্থায় ছিলেন, সেটুকু জেনে নকল কোরেছেন, এমন প্রশ্নই আসে না। অবশ্য প্রতিটি ছবিতেই কতকটা এক ধরনের অনুভূতি, জাতিগত মিল থাকতে বাধ্য, কিন্তু তার মধ্যেও তফাত আছে। গ্রিউনেভাল্‌ড্‌ বা ভান আইকের ছবিতে এমন তীব্রতা আর মানসিক অবস্থার যথাযথ ফুটে ওঠে যা ফ্রা আঞ্জেলিকোয় নেই। অথচ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দর্শকের মনে যে সব অনুভূতি হয়, তা জড়বস্তুর ছবি দেখে হওয়া সম্ভব নয়, যত ভালো কোরেই সে স্টিল-লাইফ রচিত বা আঁকা, বা রং দেওয়া হোক না কেন, যে সব অনুভূতির উদ্রেক হয় তা একান্ত মানুষের দুঃখ-কষ্ট, করুণা, মমতা থেকেই সম্ভব। সুতরাং যে সব ছবিতে মানুষী ভাব, মানুষী দুঃখ, কষ্ট, করুণা, বিস্ময়, ভক্তি, শ্লেষ, ঘৃণা থাকে সে সব ছবিকে বর্ণনামূলক বলা যায়; কিন্তু সে আখ্যার মধ্যে হেয় কিছু নেই, সে আখ্যার জন্যে ছবির রস-মূল্য কিছু কমে না। কিন্তু গণ্ডগোল তখনই হয় যখন দর্শক ছবির আখ্যান ও ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গুলিয়ে ফেলেন, ছবিটি ঐতিহাসিক ঘটনার নথি বোলে ধরে নেন, যদিও শিল্পীর সে-উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় কখনই থাকতে পারে না। কারণ ছবিতে যেটুকু ঐতিহাসিক ভাব থাকে তা নিতান্ত বাহ্য, এমন কি শিল্পী যদি ছবিতে ঐতিহাসিক যথাযথ্য আনার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন, তাহলে তার ফল ভালো হয় না। জাহাঙ্গীর বাদশার দরবারের যে সব চিত্র আছে, তাতে বাদশা এবং ওমরাহদের যথাযথ পোর্ট্রেট থাকলেও, এবং তাঁরা যেভাবে পরের পর বসেছেন, সেভাবেই আসলে বসতেন ধরে নিলেও, বিচিত্র বা অন্যান্য শিল্পীরা তাঁদের

চিত্র রচনার সময়ে স্পেস-কম্পোজিশন, অর্থাৎ কোথায় কতখানি জমি ছাড়বেন, রাখবেন, এবং কোথায় কি রং দেবেন না দেবেন, সে সব সমস্যা নিশ্চয় নিজের মতো কোরে প্রত্যেক ছবিতে সমাধান কোরতেন।

আখ্যান বা বর্ণনা ছবিতে নিশ্চয়ই থাকতে পারে; চিত্রে তার ব্যবহার ন্যায্যও বটে, সংগতও বটে, কিন্তু তা চিত্রের অঙ্গ হওয়া চাই। চিত্রের প্লাস্টিক ফর্মের সমস্ত উপাদানের সঙ্গে তার ওতপ্রোত যোগ থাকা চাই। মানুষের মনের মুকুরে, তার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের ফলে, কোন দৃশ্য বা বস্তুর ফর্ম কি ভাবে প্রতিভাত হয় তারই উপর রূপ বা ফর্মের সাধারণ সংজ্ঞা নির্ভর করে। কিন্তু ফর্ম এমন একটি গুণ যার নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তাও আছে, শুধু মানুষের মনেই তার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। এই বস্তুনির্ভর রূপটি কি তাই দেখা যাক।

খ। রূপ বা ফর্মের প্রকৃতি। * * *

বিষয়বস্তুর মতোই 'ফর্ম' কথাটি এতরকম অর্থে ব্যবহার হয়, যে 'ফর্ম' বলতে নানা লোকে নানা রকম বোঝে। তা সত্ত্বেও, সাধারণ ব্যবহারে এবং শিল্পক্ষেত্রেও কথাটির একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা খুবই সম্ভব।

সাধারণ ভাষায় কোন জিনিসের রূপ বা ফর্ম বোলতে তাই বোঝায় যা তার নিজস্ব, বিশিষ্ট চরিত্র ফুটিয়ে তোলে—যেমন টেবিল, চেয়ার, রেল এঞ্জিন, এরোপ্লেন, বা কোন ছবি বা সংগীতের রাগ। বিশ্বজগতে যাবতীয় জিনিসেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। বস্তুর বেলায় আমরা তাদের বলি গুণ; অভিজ্ঞতার বেলায় বলি অনুভূতি। যথা, টেবিলের রং ব্রাউন, তার গা মসৃণ, শক্ত, ঠাণ্ডা, আকার লম্বা, আড়াই ফিট উঁচু, আলোছায়া পড়ে, তার রং বদলায়। কিন্তু টেবিল কথাটি উচ্চারণ কোরলে শুধু এই গুণগুলির সমষ্টি বোঝা যায় না, কারণ এ গুণগুলি অন্য অনেক বস্তুর আছে। আমরা টেবিল বুঝি তখনই যখন এই গুণগুলিকে পরস্পর এক বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকতে দেখি, বা অনুভব করি, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংস্থান সম্বন্ধে, এবং পারিপার্শ্বিক

। তিন্তোরেত্তো : শেষ আহার ছবির অংশ (কুকুর)।

। বতিচেলি : প্রিমাভেরা (অংশ)।

অবস্থার সঙ্গে গোটা জিনিসটির আবার সম্পর্ক সম্বন্ধে, যে ধারণা আমাদের আছে তার সঙ্গে সংগতি দেখি। অর্থাৎ সেই সব সম্বন্ধের মধ্যেই জিনিসটির বৈশিষ্ট্য, তার একান্ত সত্তা ধরা পড়ে; তারাই টেবিলকে তার নিজস্ব রূপ দেয়। সুতরাং যাবতীয় বস্তুরই, অর্থাৎ যাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব

। দেলাক্রোয়া : রঙ্গার ও আঞ্জেলিক।

আছে তাদেরই ফর্ম বা বিশিষ্টরূপ আছে, তাদের ফর্ম আমাদের চেতনায় রেখাপাত করে, এবং যতক্ষণ না তাদের রূপ বা ফর্ম আমরা ভালো কোরে বুঝতে পারি ততক্ষণ বস্তুটি সম্বন্ধে আমাদের বোধ আসে না। যেমন টেবিলের ফর্ম নিহিত থাকে তার রঙে, শক্ত কাঠে বা ধাতুতে বা কাঁচে, তার আলোয়, ইত্যাদিতে, অর্থাৎ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পারস্পরিক বিশেষ সম্বন্ধে ও শৃঙ্খলায়, শূন্যে মাটির উপর সেটি যেভাবে দাঁড়িয়ে থাকে তার মধ্যে। শিল্প এবং

। কুর্বে : অগ্নিকাণ্ড (অংশ)।

সাধারণ ব্যবহারিক চেতনা, দুই ক্ষেত্রেই, ফর্মবিচ্ছিন্ন অনুভূতির, অর্থাৎ বিশিষ্ট আকারময় রূপ ব্যতীত নিছক ধারণার কোন অর্থ নেই, অস্তিত্বও আছে কিনা সন্দেহ।

ফর্ম কথাটির মানে নিয়ে যে অনর্থের সৃষ্টি হয়, তার প্রধান কারণই হোয়েছে যে যে-কোন বস্তু বা ঘটনার কখনও মাত্র একটি ফর্ম হোতে পারে না। যেমন মানুষ বোলতে ভারতীয় অথবা ইংরেজ, হিন্দু অথবা মুসলমান বা ইহুদী, এঞ্জিনিয়ার, বা ডাক্তার বা বিবাহিত অবিবাহিত বোঝাতে পারে। কোলকাতা নগরও বটে, বন্দরও বটে, মহাজনদের ঘাঁটিও বটে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যেমনভাবে মানুষটাকে

বা কোলকাতাকে দেখতে চায় তার উপর সেই মানুষটির বা কোলকাতার ফর্ম নির্ভর কোরবে; কোন একটিমাত্র ফর্মে তাদের সবটুকু ধরা পড়বে না। আমরা মানুষটির বা কোলকাতার কোন-রূপটি ধরে বর্ণনা কোরব, তা আমাদের উপর নির্ভর কোরবে। আমরা যত বিচিত্রভাবে তাদের দেখব, তাদের ফর্ম সম্বন্ধে আমাদের তত বহুমুখী বোধ হবে। আমাদের মন যত গভীর, যত শক্তিমান হবে ততই আমরা সব জিনিসের বৈচিত্র্য এবং সূক্ষ্মতা বেশি কোরে, আরও সমগ্রভাবে দেখতে পাব, প্রতিটি জিনিসের মধ্যে নানাবিধ বিচিত্র ফর্ম আবিষ্কার কোরতে পারবো।

যখনই ফর্মের কথা ভাবি তখন কোন জিনিসের বস্তুটি কিভাবে সংগঠিত হোয়ে তাকে বিশিষ্ট চরিত্র বা রূপ দিয়েছে,

। ফরাসী রোমান ভাস্কর্য : শ্রেষ্ঠ মেদপালক।

তাই ভাবি। কিন্তু তার উপাদান-বস্তুটি আবার নিজেই ফর্ম হোতে পারে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভারতবর্ষ অনেকগুলি প্রদেশ নিয়ে গঠিত, এমন একটি দেশ যার সমগ্র রূপ বা ফর্ম হোচ্ছে ভারতবর্ষ, আর প্রদেশগুলি হোচ্ছে তার বস্তু বা শাঁস। আবার যে-কোন প্রদেশ নিয়ে যখন তার বিভিন্ন জেলাগুলির কথা ভাবি, তখন প্রদেশটিই হয় ফর্ম, আর জেলাগুলি হয় তার বস্তু। চিত্রকলাতেও এইভাবে ধাপে ধাপে, ভেঙে ভেঙে, ভাগ করা চলে, ছোট থেকে আরও ছোট ফর্মের আলোচনায় যাওয়া যায়। যেমন ক্যানভাসের সমস্ত জায়গা জুড়ে প্রতিভাত হয় সমগ্র ছবিটির প্লাস্টিক ফর্ম, তার মধ্যে ছোট ছোট ফর্মের সৃষ্টি হয় রঙে, রেখায়, স্পেসে, আলোয়। এগুলি আবার নিজেদের মধ্যে নানা জটিল ফর্মের সৃষ্টি করে। তাদের সবগুলি মিলিয়ে তাদের সঙ্গে অলংকারের প্যাটার্নগুলি মিশে তৈরী হয় সমগ্র ছবির প্লাস্টিক ফর্ম। ঠিক যেমন জীবন্ত শরীরে কোষ থেকে আস্তে আস্তে সমস্ত শরীরের রূপটি তৈরী হয়।

যে কোন সৃষ্টিতে ফর্ম তাকেই বোঝায় যার রূপায় বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক অখণ্ড সংগঠনে গ্রথিত হয়, সবগুলি মিলে একটিমাত্র রসোত্তীর্ণ কীর্তি হয়। কথাটি যে কোন চারুকলা সম্বন্ধেই খাটে; সে ছবি সিম্ফনি, ভাস্কর্য, কাব্য, নাটক, নভেল বা ফিল্ম যাই হোক। অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও যে কোন সার্থক সৃষ্টির একটি সর্বময় অখণ্ড, ঐক্য-মণ্ডিত ফর্ম থাকবে। এবং এই ঐক্য যে সৃষ্টিতে যত বেশি থাকবে শিল্পবিচারে ততই তা মহার্ঘ বোলে পরিগণিত হবে।

সুতরাং ফর্মের অসীম বৈচিত্র্য, সম্ভাবনা থাকে; সে বিচিত্র সম্ভাবনার একমাত্র সীমা হোচ্ছে শিল্পীর নিজের সম্ভাবনা, কল্পনা, নৈপুণ্যের সীমা। অনেক বিখ্যাত সমালোচকও এই সামান্য সহজ কথাটি ভুলে যান, ফলে নিজের যেটুকু ভালো লাগে তারই সঙ্গে মিলিয়ে নানা আগ-ডুম-বাগ-ডুম মত-জাহির করেন। তাতে তাঁদের লেখার অক্ষমতা আর অতীত পূজা বা অ্যাকাডেমিক মনোভাব ধরা পড়ে। কোন বিশেষ গড়ন, সংগঠন ব্যবস্থা, ফর্ম, শিল্পীর ব্যক্তিগত চরিত্র, দৃষ্টি, অনুশীলন, শিক্ষাদীক্ষা, পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে: তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর কাজে সে সব

।চীনে পাত্র (খৃষ্টপূর্ব ১৪-১২ শতক)।

। তিন্তোরেত্তো : ভার্জিন (মেজাইদের পূজা ছবির অংশ)।

জিনিস অমোঘভাবে ফুটে উঠবে। তিনি সেগুলি কত সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন, তার উপর নির্ভর করে তিনি কত বড় স্রষ্টা তার বিচার। যে শিল্পীর তুলিতে তাঁর একান্ত নিজস্ব, ব্যক্তিগত, মৌলিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, তার প্রতি যখনই কোন সমালোচক হেয়োক্তি করেন তখনই বুঝতে হবে তিনি, অর্থাৎ সেই সমালোচক, নিতান্ত গতানুগতিক, নিষ্প্রাণ যন্ত্রবৎ বাঁধাছকের পক্ষপাতী, তাঁর মানদণ্ড সবরকম প্রাণের বিকাশের পরিপন্থী। অ্যাকাডেমিক শিল্পের মূল কথা হোচ্ছে অনুকরণের সঙ্গে নিতান্ত কারিগরি কৌশল, হাতের নৈপুণ্যের যোগ : তাতে শুধু সস্তায় কিস্তিমাতই চলে, প্রাণ থাকে না। জন সিঙার সারজেন্ট বা রবেয়ার আঁরির মতো অ্যাকাডেমিক শিল্পী মানে-র টেকনিক অনুকরণ করেন মাত্র, কিন্তু মানে-র ছবির প্রাণপাখী তাঁদের মুঠি থেকে উড়ে পালায়। ঠিক তেমনি মনে-র অনুকরণ কোরেছেন চাইল্ড হাসাম, রেডফীল্ড, গার্বার প্রমুখেরা। ভেলাসকেথ, কুর্বে জাপানী শিল্পীদের প্রাণহীন অ্যাকাডেমিক সমন্বয় করেছেন হুইস্‌লার। তেমনি সেজান, ভানগথ, মাতিস, পিকাসো, ব্রনৎসিনো, কুর্বে, কোরো, রেনোয়ারের ছবির বাহ্যগুণের পরের পর অনুকরণ কোরে করে গেছেন দেরাঁয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা যামিনী রায়ের চিত্রের অ্যাকাডেমিক সমন্বয়ও দেখতে আমরা অহরহ অভ্যস্ত। (এই অধ্যায়টি আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত হবে)

ছোট একটি ছবি, কিংবা তার চেয়ে ছোট একটি ফুল, নয় তো মুহূর্তের জন্যে সেতারের তারে মূর্চ্ছিত একটি মীড়,
—অনন্ত বেঁধেছে তার নীড়!

গ্রন্থকীট

গ্রন্থজগৎ

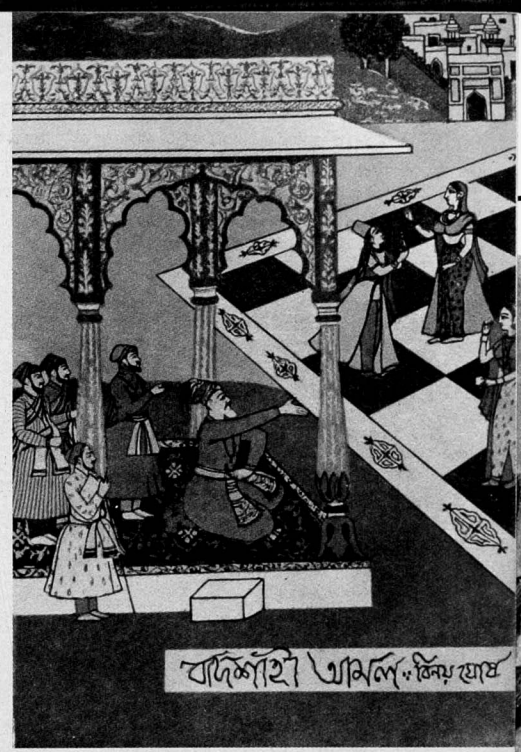

প্রচ্ছদশিল্পী : অজিত গু

বাদশাহী আমল—বিনয় ঘোষ। মোগলযুগে যে সকল বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৬৫৮ সাল থেকে ১৬৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের নানা জায়গায় ভ্রমণ কোরে যে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ কোরে যান, ঐতিহাসিকদের কাছে তার মূল্য অনেক। তার একটি বিশেষ কারণ, বার্নিয়ের একজন তথাকথিত সৌখিন ট্যুরিষ্ট ছিলেন না। তিনি ছিলেন 'দার্শনিক পর্যটক'। তাঁর মন ছিল যুক্তিনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত; পর্যবেক্ষণশক্তি অসাধারণ, অন্তর্দৃষ্টি ছিল সুগভীর। সুতরাং তাঁর গ্রন্থ যে অমূল্য তাতে নিঃসন্দেহ।

বার্নিয়েরের এবংবিধ মূল্যবান ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসরণ কোরে সম্প্রতি মনস্বী লেখক শ্রীবিনয় ঘোষ 'বাদশাহী আমল' নামে যে গ্রন্থটি প্রণয়ন কোরেছেন, নানা কারণেই তা ভারতীয় ইতিহাস-অনুরাগী ও সংস্কৃতি-সন্ধিৎসুদের সংগ্রহ কোরে রাখা আবশ্যক। 'বাদশাহী আমল' বার্নিয়েরের ভ্রমণকাহিনীর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নয়; মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসের যে সমস্ত উপকরণের জন্য এই ভ্রমণবৃত্তান্তের মূল্য, শুধু সেই মূল্যবান উপকরণসমূহ বিনয়বাবু সযত্নে সংকলন কোরে অনুবাদ কোরেছেন এবং প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী সহযোগে তা আরো মূল্যবান কোরে তুলেছেন।

এ-হেন সমাজচেতন বার্নিয়ের সপ্তদশ শতকের ভারতবর্ষের শিল্পী ও শিল্পকলার অবস্থা সম্পর্কে তিনি যা বোলে গেছেন, শিল্প-পত্রিকা সুন্দরম্-এর পাঠকবর্গের জন্য তা উদ্ধার কোরে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। বার্নিয়ের বোলেছেন :

'এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কোন দেশের শিল্পকলার সুস্থ বিকাশ হতে পারে কি? পারে না। কোন শিল্পী শিল্পকলার উৎকর্ষের জন্য এই পরিবেশের মধ্যে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন না। চারিদিকে যে দেশে দারিদ্র্যের বীভৎসতা প্রকট হয়ে থাকে এবং ধনীরা যেখানে সরলতার ভান করে কৃপণতাকে জীবনের ধর্ম বলে গ্রহণ করেন, সুলভ মূল্যের দ্রব্যাদির জন্য সেখানে সকলে লালায়িত, সেখানে শিল্পকলার আসল উৎকৃষ্টতা বা সৌন্দর্য বিচার্য বস্তু নয়, তার কোন মূল্য নেই। যে দেশের ধনীরা ফকিরের জীবন যাপন করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন, না খেয়ে না পরে কেবল মাটির তলায় টাকা পুঁতে রাখতে চান, খরচ করতে চান না এবং করতে জানেনও না, তাঁদের জীবন সম্বন্ধে কোন উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকতেও পারে না। আর যাই হন, তাঁরা কখন শিল্পকলার সমঝদার বা পৃষ্ঠপোষক হতে পারেন না। এই অবস্থায় শিল্পকলা বা শিল্পীর বিকাশ বা সমৃদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যেখানে শিল্পীদের তথাকথিত অপরাধের জন্য কথায় কথায় বেত্রাঘাত পর্যন্ত করতে সঙ্কোচ হয় না, সেখানে শিল্পীরা তো মানুষ বলেই গ্রাহ্য নন? শিল্পীদের সেখানে কোন মর্যাদা নেই, কোন স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের অধিকার নেই। তাঁদের সৃষ্টির জন্য কোন ব্যক্তিগত সম্মানও তাঁদের দেওয়া হয় না। তাঁরাও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর মতন দাসত্বই করেন। যেখানে শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা নেই এবং তার কোন স্বীকৃতিও নেই, সেখানে শিল্পকলার উন্নতির জন্য শিল্পীরা কোন প্রেরণা পেতে পারেন না। শিল্পীদের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। অর্থ উপার্জনের কোন স্বাধীনতা শিল্পীদের নেই। ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করার ব্যক্তিগত অধিকারও নেই। বংশপরম্পরায় শিল্পীদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই এইজন্য দায় হয়ে ওঠে। সামান্য অর্থও সঞ্চয় করার অধিকার তাদের নেই। একেবারে ঠিক ক্রীতদাসের মতন অবস্থা। একটু মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন না, কারণ পোষাক দেখে যদি আমীর ওমরাহ বা জায়গীরদার-জমিদারদের মনে সন্দেহ হয় যে তিনি বিত্তশালী, তাহলে তাঁর পরিত্রাণ নেই। আমার বিশ্বাস, হিন্দুস্থান থেকে শিল্পকলার অস্তিত্ব বহুদিন আগে বিলুপ্ত হয়ে যেত যদি বাদশাহ ও আমীর ওমরাহরা নিজেরা বেতনভুক শিল্পী নিয়োগ না করতেন, তাঁদের বংশধরদের শিল্পশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না করতেন এবং সবার উপরে, পুরস্কার ও তিরস্কার বা চাবুকের ভয় না দেখাতেন। ধনিক, বণিক ও ব্যবসায়িশ্রেণীও শিল্পীদের নিজেদের কাজকর্মের জন্য নিয়োগ করেন এবং তার জন্য শিল্প ও শিল্পীর অস্তিত্ব কিছুটা বজায় থাকে। অনেক সময় তাঁরা বেশী বেতনও দেন। কোন মহাশুভবতা বা উদারতার জন্য বেশি দেন না, সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থের জন্য, কাজের তাগিদে দিতে বাধ্য হন। চাবুকের ভয় দেখিয়ে ধনিক-বণিকরাও কারিগর ও শিল্পীদের কাজ করাতে দ্বিধাবোধ করেন না। কারিগর ও শিল্পীদের কোন উপায়েই ধন সঞ্চয় করার উপায় নেই। দুবেলা দুমুঠো খেয়ে, সামান্য মোটা কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করে তাঁরা বেঁচে থাকতেন এবং তাতেই তাঁরা খুশি। তাঁদের তৈরী কারুশিল্পাদির ব্যবসা করে প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন বণিকরা এবং বণিকদের একমাত্র লক্ষ্য হল, তাঁদের পৃষ্ঠপোষক যাঁরা তাঁদের সন্তুষ্ট করা, শিল্পীদের নয়।'

মোগলযুগে শিল্পকলার যে অভূতপূর্ব উন্নতি হোয়েছিল, শিল্পরসিক ও ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে তা অজানা নয়। বস্তুত মোগলযুগের শিল্পোৎকর্ষের তুলনা বড় একটা মেলে না। কিন্তু যাদের প্রাণপাত পরিশ্রমে শিল্পকলার এই অতুলনীয় উন্নতি সম্ভব হোয়েছিল, সেই শিল্পীরা যে দুর্বহ দারিদ্র্যের অভিশাপে চোখের জলে দিন কাটাতেন, সমসাময়িক বার্নিয়েরের উদ্ধৃত উক্তিতে তার প্রমাণ বর্তমান।

ঐশ্বর্যোচ্ছল ঐতিহাসিক সেই মোগলযুগ অতীত হোয়েছে। আরও নানা তরঙ্গসংকুল কালান্তরের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ আজ বিশ শতকে এসে উপনীত। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা তার করায়ত্ত। কিন্তু সপ্তদশ শতকের বার্নিয়ের-ভারতবর্ষে শিল্পীদের যা আর্থিক অবস্থা ছিল, আজ তার কতটুকু উন্নতি হোয়েছে? শিল্পীদের যে করুণ অবস্থার কথা বার্নিয়ের বোলে গেছেন, আজকের ভারতবর্ষের সাধারণ শিল্পীরা দুর্ভাগ্যের সেই তিমিরেই পড়ে নেই কি?

ভারতীয় প্রাচীন চিত্র প্রসঙ্গে

অর্দ্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

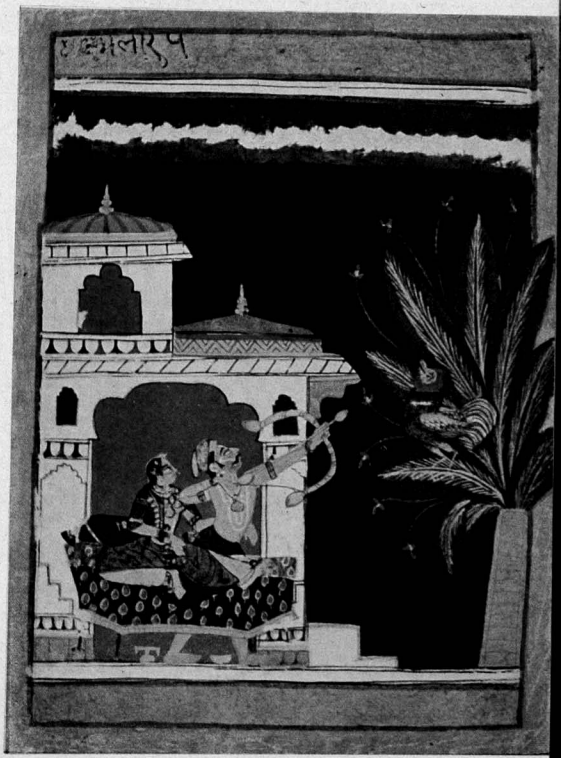

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ভারতীয় চিত্রকলা কেবলমাত্র দুইটি শাখায় পরিচিত ছিল—বৌদ্ধযুগের অজন্তা-গুহার চিত্রাবলী এবং মধ্যযুগের দরবারী চিত্রমালা। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের গভীর গবেষণা ও ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে নানা অজ্ঞাত শিল্প-শাখার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সমাবেশে ভারতীয় চিত্রকলার বিস্তৃত মানচিত্র সমস্ত অঙ্গ ও অবয়বে পরিপূর্ণ হইয়া এক বিচিত্র রূপ ও ঐশ্বর্যে কলারসিকদের তৃষিত চক্ষুর সম্মুখে উদঘাটিত হইয়াছে—তাহার রূপ যেমন বিচিত্র ও ব্যাপক, তেমনই সমুজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষক। এইসব বিচিত্র শিল্প-শাখার উপাদানের মাধ্যমে, আমরা ভারতীয় চিত্রকলার ধারাবাহিক ইতিহাসের সন্ধান

পাইতেছি। এই ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ বৎসরে চিত্রিত মহেঞ্জোদারোর চিত্রমালা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঘারওয়ালের কলা-শিল্পী মোলারামের পাহাড়ী চিত্রকলায় শেষ হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ ও বহুবিস্তৃত ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্রও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আমরা মাত্র চারিটি নিদর্শন অবলম্বন করিয়া ভারতীয় চিত্রকলা বহুমুখী বিকাশের একটা স্থূল আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের প্রথম চিত্র—রাজপুত চিত্রকলার আদিম যুগের একখানি রাগিণী-চিত্রের নমুনা। এই শাখার আবিষ্কর্তা ভারতের অদ্বিতীয় কলা-রসিক স্বর্গত ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী। তিনিই প্রথমে রাজপুত চিত্রকলার এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার আবিষ্কার করেন ও এই শাখার নিপুণ রস-বিচার করিয়া ইহার মূল্য নির্ধারণ করেন। তাঁহার আবিষ্কারের পর এই শাখার চিত্রাবলী রূপরসিকদের সমাজে—'প্রিমিটিভ্ রাগিণী' নামে সুপরিচিত হইয়াছে। এই শাখার রচনাকাল (কিছু বাদানুবাদের ফলে), আন্দাজ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি নির্ধারিত হইয়াছে। আমাদের দেশের অতি-

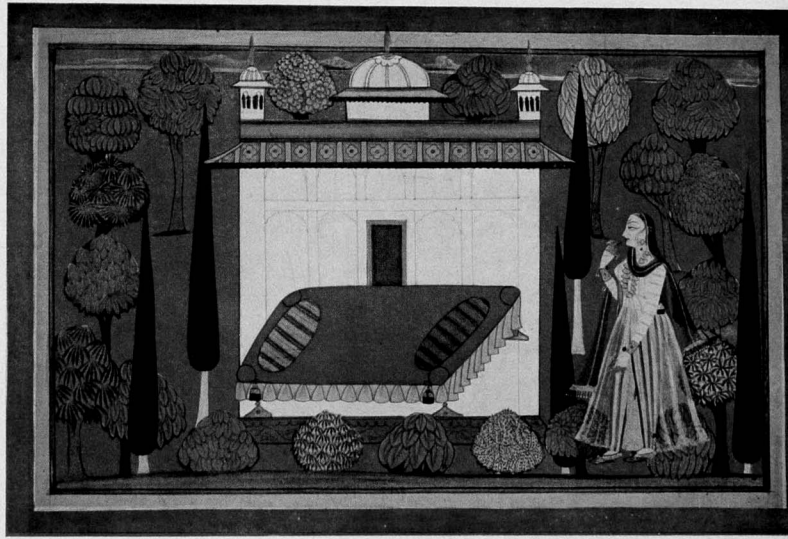

আধুনিক নব্য শিল্পীদের মুখে প্রায়ই প্রিমিটিভ চিত্রকলার গুণগান শুনিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদের চক্ষে এই রাজপুত প্রিমিটিভ্ রাগিণী-চিত্রগুলি বিশেষ আদর লাভ করে নাই। অনেকেই এই শাখার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ।

"কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি সংগীতে,—শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য,—এই তিন যুগের, তিন দশার তিনটি বিভিন্ন বয়সের মানুষের রচনা-মালা, যুগে যুগে, রূপ ও রস-সৃষ্টির ইতিহাসে তাহার প্রমাণ রেখে গেছে। রসবিদ্ সমালোচকরা তাঁদের নিপুণ রস-সৃষ্টির সূক্ষ্ম দাঁড়িপাল্লায় এই তিন যুগের ভিন্ন রীতির

বিভিন্ন সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকাশের যথার্থ মূল্য ও ওজন নির্ধারণ কোরে দিয়েছেন।

বর্বরযুগের অসভ্য মানুষের হাতে লেখা জীবজন্তুর চিত্র ও হাতে কাটা নানা পশুর রূপ,—সভ্য ও শিক্ষিত মানুষের বৈজ্ঞানিক নিখুঁত নকলের তুলনায়—রসে ও ভাবে অনেক শ্রেষ্ঠ। শত সহস্র বৎসর পূর্বে লেখা স্পেনের আল্‌-তামীরা গুহার পশুচিত্র —ল্যান্‌ড্‌সীয়ারের নিখুঁত পরিপাটি পশু-চিত্রকে—ভাবের গুণে ও রসের শক্তিতে প্রকৃষ্টরূপে পরাস্ত কোরেছে। এই ভাব ও রসের আদর্শের মাপ-কাঠিতে, হেলেনীয় যুগের পূর্বগামী গ্রীকশিল্পের ভাস্কর্য (যথা,—সাইপ্রাস্‌ ও ক্রীটের মৃত্তি-রচনা) এবং উনিশ শতকের নিগ্রো শিল্পীদের কল্পিত দেবতার প্রতিমা গ্রীকদেশের ক্ল্যাসিকাল বা পরিণত-যুগের রচনার বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। এবং এই তুলনা-মূলক বিচারে, আলেকজান্দারের যুগের হেলেনেসীয় শিল্প জরাগ্রস্ত, মৃত ও পূতিগন্ধময় শিল্পের নিতান্ত ভাবহীন, রসহীন, অন্তঃসারশূন্য কঙ্কালমাত্র। ঋগ্বেদের তিন স্বরে গঠিত আরাধনা-সংগীতে, প্রাচীন পালি গাথায়, বাউলের গানে, ও বৈষ্ণব সাধকদের পদাবলীতে—যে সদ্যোজাত শিশু-সুলভ অনাবিল রসানুভূতি ও অকৃত্রিম

ভক্তিবাদের সরল আনন্দ ও রূপোল্লাসের পরিচয় আছে —ভাস ও কালিদাস, দণ্ডী ও ভারবির পণ্ডিতী কবিতায় ও আলংকারিক ভণিতায় তাহার একান্ত অভাব। ইতালীর একাদশ শতকের ভক্ত চিত্রকরদের (বৈজন্তাইন চিত্র, মার্জারিতোন্‌) এবং ডুচিয়োর শিশু-সুলভ 'অক্ষম' অথচ ভক্তিপূর্ণ রস-রচনায় যে মাধুর্য, যে ভাব-সম্পদ ও অকৃত্রিম স্বচ্ছ মানসিকতার পরিচয় আছে,—মিচেল্‌-এঞ্জেলো, বতিচেল্লী, বা রাফেলের আপাত-রমণীয় বাহ্যিক আকর্ষণের কুশল ও কৃত্রিম ভক্তিহীন, চিত্র-রচনায় তার কোনও চিহ্ন নেই। ভারতের রাজপুত শিল্পের আদিযুগের রাগ-রাগিণীর চিত্রে, প্রাচীন বাংলাদেশের 'পটে' ও পুঁথির পাটার চিত্রে —যে রস, যে ভাব, যে অকৃত্রিম ও অনাবিল স্বচ্ছতার চিত্র ফুটেছে—মুঘলযুগের কুশলী কলমের ওস্তাদী কায়দায় লিখিত পরিপাটি দরবারী চিত্র-শিল্পে—সে রস, সে ভাব,—অনুসন্ধান করিলেও মিলবে না।

শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ—প্রিমিটিভ্‌, ক্ল্যাসিক্যাল ও ডেকাডেন্ট—এই তিন দশার মধ্য দিয়া যুগে যুগে দেশে দেশে শিল্পসৃষ্টির জীবনের উপাখ্যান ও আত্মচরিত রচিত হয়েছে।

রূপ-রসিকদের বড় আদরের বস্তু ঐ মানুষের সভ্যতার প্রত্যূষকালের বাল-সূর্য—ঐ আদিযুগের শিশুচিত্তের আদিম প্রকাশ—ভাব ও রসের অকৃত্রিম নির্ঝরণী—ঐ প্রিমিটিভ্‌স্‌।"*

এখন দেখা যাক—আমাদের এই প্রাচীন রাগিণী-চিত্রের নমুনায় প্রিমিটিভ রীতির চিত্রকলার কোন্‌ কোন্‌ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে ছবিটির উজ্জ্বল ও উৎকট বর্ণসমাবেশ রক্তলাল ও ঘননীলের দ্বন্দ্ব—ছবিটিকে আন্দোলিত করিয়া রাখিয়াছে। রঙের ঝংকার (ভাইব্রেশন্‌) মাতিশ্‌ ও ফান্‌-গো-র প্রখর বর্ণের উল্লাসকে সহজেই মনে করাইয়া দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ফ্রান্সের অতি আধুনিক রীতি, ভারতে তিনশত বর্ষ আগে সূচিত হইয়াছে। প্রিমিটিভ্‌ শিশুবাদী চিত্রের রস কি, তাহার আস্বাদন করিতে আমাদের ফ্রান্সে ছুটিতে হইবে না। ভারতের চিত্রকলার সাধনার মধ্যে তাহার প্রচুর উপাদান আছে। এই ছবির আর একটি গুণ হইল—'অক্ষম' অথচ সাবলীল রেখা রচনা, কোনও পরিশ্রম, কোনও প্রয়াস ও পরিপাট্যের চিহ্নমাত্র নাই। মানুষ দুটির মুখ ও অবয়ব চিত্রে কোনও অস্থি-বিদ্যার বালাই নাই। সহজ, সরল, নৈপুণ্য-বর্জিত তাচ্ছিল্যতার অনায়াস চিত্র। অথচ বর্ণের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং রেখা-মালার আন্দোলনে প্রচুর চাঞ্চল্য বিদ্যমান। আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল—শিশুসুলভ পরিমাণবোধের একান্ত অবহেলা। গাছের উপর কুক্কুট পক্ষীর চিত্র—পরিমাণে অত্যন্ত অতিকায়। এবং নারিকেল গাছের পাতার তুলনায় গাছের কাণ্ডটি অত্যন্ত হ্রস্বাকৃতি। বাস্তবিক রীতিতে নারিকেল গাছের মাথা প্রাসাদকে ছাড়াইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু তাহা করেন নাই চিত্রকর। বিষয় বস্তুর বিবরণে—কুক্কুট পক্ষীর ভূমিকা—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং তাহার অবয়ব চিত্রকর অতিকায় পরিমাণে চিত্রিত করিয়াছেন। উপরে আকাশের কোণে মেঘের আভাস—বাস্তবিক রীতিতে চিত্রিত নহে। এই আকাশে সাদা আঁচড়ের দুইটি কারণ আছে। একটি গল্পের তাগিদ, দেখাতে হইবে ভোর হইয়াছে তাই রাত্রির কালো অন্ধকারের কপালে—সাদা চন্দন চড়াইয়া প্রত্যূষের আভাস দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় তাগিদ হইল—একঘেঁয়ে নিরবচ্ছিন্ন নীলিমার ওজন ভাঙিয়া দেওয়া। আর একটি উদ্ভট কল্পনা হইল—নারিকেল পাতার মাঝে মাঝে সাতটি লাল রঙের সাবলীল রেখা ; ঐরূপ লাল ছড় নারিকেল গাছে জন্মায় না। কুক্কুট পক্ষীর চিৎকার যে অন্ধকার নীল আকাশের আবরণ ভেদ করিয়া চারিদিকে ছুটিয়াছে—এইগুলি তাহার সাঙ্কেতিক চিত্র, শব্দের চাক্ষুষ-ব্যঞ্জনা।

এইবার ছবিটির বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা দিতে হয়। ছবিখানি প্রাতঃকালে গেয় 'বিভাষা' রাগিণীর চাক্ষুষচিত্র। প্রেমিকযুগল সারারাত অন্তে রতিক্রীড়া করিয়া ভোরে পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময় তাঁহাদের সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া গাছের উপর এক অরসিক কুক্কুট-পাখি ডাকিয়া উঠিল এবং নায়ক রুষ্ট হইয়া কানের কুণ্ডল দুলাইয়া পাখিকে স্তব্ধ করিবার জন্য ধনুকে শরযোজনা করিলেন—এই হইল এই রাগিণীর রস-রূপ। এই বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষায়

*'প্রভাতী' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের—'ঐ আদি যুগের আদিম মানুষ'—প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত। লেখকের ইংরাজী নিবন্ধ 'দি প্রিমিটিভ্‌স্‌' প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

নানা রসাল কবিতা রচিত হইয়াছে তাহার একটিমাত্র উদ্ধৃত হইল :

"শুভ্রাম্বরো গৌর বর্ণঃ সুকণ্ঠিঃ, ধীরোল্লসদ্ কুণ্ডল-ধৃষ্ট-গণ্ডঃ
অরুণোদয়ে কুক্কুট-পক্ষী শব্দে বিভাষ-রাগঃ
স্মর-চারু মূর্ত্তিঃ ॥"

আমাদের দ্বিতীয় চিত্র—কোনও রস-বস্তর রহস্যময় চিত্র নহে—সাদামাটা একজন মানুষের বাস্তবিক প্রতিকৃতি—পোর্ট্রেট্। ইনি খুব সম্ভবত জয়পুরের মহারাজা জগৎ-সিংহ। এই মহারাজার আরও কয়েকখানি প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে।

আসল মানুষটিকে আমরা দেখি নাই; সুতরাং হুবহু সঠিক প্রতিকৃতি হইয়াছে কিনা তাহার বিচার করা যায় না। পুরাতন কালের সব প্রতিকৃতি সম্বন্ধে ঐ একই কথা খাটে। রেম্ব্রাণ্টের অসংখ্য পোর্ট্রেট্, কিংবা গেনস্-বরোর 'মিসেস্ সিডন্স্'—সঠিক প্রতিকৃতি কিনা তাহার বিচার করা অসম্ভব। এইসব ওস্তাদ্ শিল্পীদের হাতে লেখা পোর্ট্রেট্, প্রতিকৃতি হিসাবে নয়, রং-রেখার সৃষ্টি হিসাবে, চিত্র হিসাবে বিচার করিতে হয়। রাজস্থানে রাজাদের প্রতিকৃতি চিত্রলেখার একটি প্রাচীন ধারা অনেক শতাব্দী প্রচলিত ছিল। তাহাদের ধারা, রীতি ও শৈলী মুঘলযুগের দরবারী প্রতিকৃতি-লেখা হইতে বিভিন্ন, রাজস্থানী প্রতিকৃতি-চিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শৈলী। এই রাজস্থানী শৈলী মুঘলাই শৈলীর বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। শেষের দিকে মুঘলাই ও রাজস্থানী রীতি পরস্পরকে কিছু কিছু প্রভাবিত করিয়াছে। আগে রাজস্থানের প্রতিকৃতি-চিত্র বড় আকারের দেওয়ালের উপর ভিত্তি-চিত্র (ফ্রেস্কো) হিসাবে আঁকা হইত। পরে মুঘল দরবারের ফ্যাশান অনুসরণ করিয়া মুরক্কার (এল্বাম্) জন্য ছোট ছোট মিনিয়েচার আকারে লিখিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়।

আমাদের আলোচ্য চিত্রটি লাল রঙের পটির ফ্রেমে আঁটা সবুজ বর্ণের পটভূমিকায় ফুটাইয়া তোলা একখানি অলৌকিক আলেখ্য, কেবলমাত্র গন্ধে লেখা ফটোগ্রাফ নহে। বিরাট পাগড়ী পরাইয়া, মণিমুক্তার গহনা দিয়া লাল রঙের দোপাট্টার পাট্ জড়াইয়া এবং লম্বা জুব্বার নীচে চওড়া লাল পাড় ছড়াইয়া দিয়া মূর্তিটিকে একখানি জম্জমাট ছবি করিয়া তুলিয়াছেন রাজস্থানের একজন অজ্ঞাত চিত্রকর। সবুজ মাঠের পৃষ্ঠভূমি উপরের দিকে অকাশ ছুঁইয়াছে আর উপরের ঘননীল আকাশ ও নীচের সবুজ সমারোহের মধ্যে ব্যবধানের মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে—সাদা সাদা গোলাল মেঘের ঝালর জুড়িয়া দিয়া। প্রতিকৃতি-চিত্রের মেঘের যোজনা—মুঘলাই রীতির অনুসরণ।

আমাদের তৃতীয় চিত্র—পাহাড়ী শৈলীর বাশৌলী কলমে আঁকা একখানি নায়িকা-চিত্র। বাশৌলী কলমের ছবিতে—বিশেষত ইহাদের চড়া রঙের কল্পনা, গাছ-পালার অঙ্কনের রীতিতে, এবং নায়ক-নায়িকার মূর্তি-রচনার অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রিমিটিভ্ রীতির চিত্রের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। ভারত-কলার বিশেষজ্ঞরা বাশৌলী কলমের ছবিকে পাহাড়ী শৈলীর আদিমকালের প্রথম রীতি হিসাবে, ইহাদের প্রিমিটিভ্ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য চিত্রে, গাছের ছবি-গুলিতে এক একটি পাতা স্বতন্ত্র করিয়া লিখিয়া বাশৌলীর অজ্ঞাত চিত্রকর তাঁহার শিশুমনের সরলতার প্রমাণ দিয়াছেন। ছবিটির বিষয় হইল—"বাসক-শয্যার নায়িকা"। নায়িকা, ঘন বৃক্ষাবলীর দ্বারা প্রচ্ছন্ন নিভৃত এক গৃহে নায়কের জন্য শয্যা রচনা করিয়া তাঁহার আগমনের আশায় উদ্বিগ্ন মনে কেলীগৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং প্রহর গণিতেছেন। নায়িকার একমাত্র সহচরী চারিটি দীর্ঘ ঝাউগাছ—নায়িকার মতোই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নায়িকার দাঁড়ানোর ছবিটির প্রতিধ্বনি করিতেছে—তাহাদের সোজা দীর্ঘ কালো কালো রেখায়। ছবিটিতে ২০টি গাছ চিত্রিত হইয়াছে। এতগুলি গাছের ভীড়ের উদ্দেশ্য—নায়কহীন শূন্য ঘরের রিক্ততাকে চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরা। অনেক বস্তু আছে—কেবল যিনি আসিলে ছবিটি সম্পূর্ণ হয়—তিনিই আসেন নাই। এই হতাশার চিত্রটি বড় করুণ সুরে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শূন্য ঘরের অবিচ্ছিন্ন সাদা বর্ণে। "এ ভরা ভাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।" এই ছবির পিছনে একটি হিন্দী 'কবিও' উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহাতে নায়িকা এই আক্ষেপই করিয়াছেন যে বর্ষা ঋতুর দীর্ঘ কাত্রিতে নায়িকাকে নায়কের শূন্য শয্যা পাহারা দিয়া কেবল চোখের জলেই বর্ষার উৎসব পালন করিতে হয় :

"নিজ নৈননকো বরষা বরষা তরসা তন
আঁসুন ধোবতী হৈঁ।

কহু রাম চরিত্র ন রোবতী হৈঁ দিলকী
দিলহী বিচ গোবতী হৈঁ ॥
হাম তো নীত পাবসকী রিতুমেঁ সখি
সুনিহী সেজ টটোবতী হৈঁ।
ধনি বৈ ধনি পাবসকী রতিয়াঁ পতিকী
ছতিয়াঁ লগি সোবতী হৈঁ ॥

—হায় হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য!—এই বর্ষা রাতে যখন অন্য অন্য ভাগ্যবতীরা তাহাদের পতির বুকে সুখে নিদ্রা যাইতেছে—আর আমাকে বঁধুর শূন্য শয্যা পাহারা দিয়া রাত কাটাইতে হইতেছে।

আমাদের চতুর্থ নিদর্শন হইল কাংড়া শৈলীর একখানি পরিণত রীতির সুমধুর ও নয়নাভিরাম চিত্তহারী চিত্র। ইহাতে বাশৌলী কলমের উৎকট বর্ণসমাবেশ নাই, মোটা তুলির সহজ সরলতা নাই—আছে মিষ্টি রং আর সূক্ষ্ম রেখার সুমধুর ঝংকার—পাকা ওস্তাদের হাতের সুমিষ্ট টংকার। হাল্কা নীল, হাল্কা হলুদ, আর হাল্কা লালের—তিনটি 'বাদী' স্বরে গাঁথা—সুষ্ঠু সংগীত। কিন্তু ওস্তাদ চিত্রকর—এই তিন রঙের মধুর মিলনে মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন রাধার কলহের ছবি। অনেকদিন পরে শ্রীকৃষ্ণ রাধার কাছে আসিলেন কিন্তু দুর্জয় মানের আঘাতে নায়ককে রুষ্ট করিলেন, তিনি ক্রোধ ভরে ঘর ছাড়িয়া বহির্গত হইলেন। এই কলহের ছবিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে নায়ক নায়িকার মধ্যে—একটি বিভেদের স্তম্ভ রচনা করিয়া বৈষ্ণব কবিরা এই পরিস্থিতির নাম দিয়াছেন—'কলহান্তরিতা নায়িকা'। কলহের পর রাধার পশ্চাত্তাপ ও আক্ষেপের কথা করুণ সুরে গাঁথিয়া দিয়াছেন একজন হিন্দী কবি; তাঁহার নাম চিরঞ্জীব :

"আয়ে লালা কহুঁতে গৃহমৈ জিন্‌কে ময়্
উমংগমে মান দিখায়ো।
ইৎনে পৈ রুঠীভঙ্গ ন উনে কর
থাম্‌ভি বৈঠায়ো ॥
কেয়া কহুঁ আপনা মতিকো চিরঞ্জীবজু
প্রীতমকো ন মনায়ো।
লাজ্‌কে কাজ্ অরু সজনি! আপনা
অনুরাগমৈ দাগ লগায়ো।"

—তিনি যখন আমার ঘরে আসিলেন আমি উৎকট মান দেখাইয়া তাঁহাকে রুষ্ট করিলাম—তিনি চলিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিলেন, আমি হাত ধরিয়া তাঁকে বসাইলাম না, কি বলিব আমার দুষ্টবুদ্ধিকে—আমি মানের গর্বে আমার নিষ্কলঙ্ক প্রেমের উপর কালো কলঙ্কের দাগ লাগাইয়াছি।

রাজস্থানী চিত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব সচ্ছ ছিল না। রাজস্থানী কলমে চিত্রিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের আলোচনা ও সমালোচনা অতি অল্পদিন সুরু হইয়াছে। আমাদের নির্বাচিত চারিখানি চিত্রে—ভারতীয় চিত্রকলার বিস্তৃত ইতিহাসের বহুমুখী প্রতিভার কিছু আভাস 'সুন্দরম্' পত্রিকার সুরসিক পাঠকগোষ্ঠী পাইবেন বলিয়া আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস।

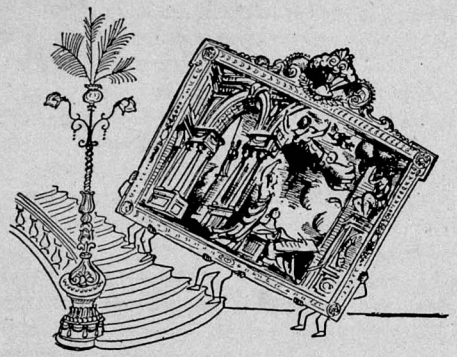

ডুভিন

আশু চট্টোপাধ্যায়

শিল্পজ্ঞানে ডুভিনের এক গুরু ছিলেন, তাঁর নাম বার্ণার্ড বেরেনসন। বেরেনসন ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন। উত্তরজীবনে ইটালিয়ান আর্টের উপর তাঁর বইগুলি ভুবনবিখ্যাত হোয়েছিল। এবং এই ইটালিয়ান আর্ট শেখবার জন্যই জনকয়েক আমেরিকান তাঁকে চাঁদা তুলে ইটালিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ফ্লোরেন্স্ শহরে 'ইল্-তাত্তি' নামে তাঁর বাগান-ঘেরা ছোট বাড়িটি আজও শিল্প-রসিকদের তীর্থস্থান। দীর্ঘ ছিয়াশি বছর ধরে বেরেনসন কত যে আর্টের নমুনা আর কত যে আর্টের বই সংগ্রহ কোরেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এ সমস্তই তিনি উইল কোরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছেন। আর্টে তাঁর পাণ্ডিত্য সুগভীর ছিল, তাই তিনি সমগ্র ইটালিয়ান জাতির শ্রদ্ধাও অর্জন কোরেছিলেন; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের হাতে তিনি যাতে না পড়েন সেজন্য তারাই তাঁকে লুকিয়ে রেখেছিল। তাঁর কাছে নিয়মিত যাঁরা আর্টের উপর লেকচার শুনতে যেতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান লেখিকা ইডিথ হোয়ার্টন, বিখ্যাত লেখক মার্সেল প্রুস্ত্, লণ্ডনের ন্যাশানাল গ্যালারির ডিরেক্টর সার কেনেথ ক্লার্ক, ওয়াশিংটনের ন্যাশানাল গ্যালারির প্রধান কিউরেটর জন ওয়াকার, 'আর্ট নিউজের' সুপণ্ডিত সম্পাদক ডক্টর অ্যালফ্রেড ফ্র্যাঙ্কফার্টার এবং ডুভিন। ডুভিনের জীবনে বিস্ময়কর সাফল্যের পিছনে বেরেনসনের দান বড় কম ছিল না। চৌষট্টি বছর বেরেনসন ইটালিতে বাস কোরেছেন এবং গত অর্ধশতাব্দী ধরে পৃথিবীতে ইটালিয়ান আর্টের যা কিছু লেনদেন হোয়েছে তার বেশিরভাগই তাঁর পরামর্শ অনুসারে। শেষ পর্যন্ত দুই অক্ষর বি-বি নামেই সকলে তাঁকে জানে।

বেরেনসনের সঙ্গে ডুভিনের প্রথম দেখা হয় লণ্ডনে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে। এই সাক্ষাৎ ঐতিহাসিক। ডুভিনের তখন বয়স সাঁইত্রিশ বছর। সার আলফ্রেড স্যাসুনের স্ত্রী লেডি স্যাসুন বেরেনসনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন ডুভিনের আর্ট-গ্যালারি দেখতে যাবার জন্য। বেরেনসন রাজি হোলেন কেবল এক সর্তে যে লেডি স্যাসুন ডুভিনের কাছে তাঁর পরিচয় দেবেন না। গ্যালারিতে একটি

সত্যিকারের ভালো ছবির সামনে বেরেনসন থমকে দাঁড়ালেন এবং তাঁর মক্কেল মিসেস গার্ডনারের জন্য সেটি কেনা স্থির কোরলেন। ডুভিন কাছে আসতেই কিছুমাত্র ভূমিকা না কোরে তিনি বোললেন, "এই ছবিটির জন্য আমি তিরিশ হাজার পাউণ্ড দিতে রাজি আছি।"

ডুভিন লেডি স্যাসুনের দিনে চেয়ে বোললেন, "এই লোকটি বড় বেশি জানেন দেখতে পাচ্ছি", এই বোলে হাসলেন।

বেরেনসন বিদায় নিলেন। ডুভিন ছবিটি তাঁকে দিলেন না, সেটি তিনি পরে ষাট হাজার পাউণ্ডে বিক্রী কোরেছিলেন। কিন্তু আলাপ করিয়ে না দিলেও তিনি বেরেনসনকে চিনতে পেরেছিলেন। কয়েকদিন পরেই তিনি তাঁকে খুঁজে বের কোরলেন এবং প্রস্তাব কোরলেন ইটালিয়ান ছবি কেনার ব্যাপারে বেরেনসন ডুভিনের পরামর্শদাতা হোন। প্রতি বছর ডুভিন তাঁকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা ফি হিসাবে দেবেন, তাছাড়া প্রতিটি ছবির উপর কমিশন থাকবে। বেরেনসন প্রস্তাবে সায় দিলেন একটি সর্তে যে কেনা ছবিগুলির বিক্রীর ব্যাপারে তাঁকে মাথা ঘামাতে হবে না। ডুভিন তাতে খুব রাজি; কারণ ছবি কি কোরে বিক্রী করতে হয় সে-বিদ্যা তাঁর জানা ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে বেরেনসন যা অর্থোপার্জন কোরেছিলেন এ-যাবৎ কোনো লেখকের ভাগ্যে তা জোটেনি।

কিন্তু বহু বৎসর পরে একটি ইটালিয়ান ছবি নিয়েই এই যৌথ কারবার ভেঙে গেল। তার আগে ছবি নিয়ে তাঁদের মধ্যে যে মতবিরোধ হয়নি তা নয়। ডুভিনের লণ্ডন গ্যালারীতে বহুদিন ধরে ম্যাসাকিওর আঁকা একটি চমৎকার ছবি পড়ে ছিল, ছবিটি বেরেনসনের আগ্রহাতিশয্যেই কেনা। কিন্তু তার মধ্যে এমন একটা বিষণ্ণ আবহাওয়া ছিল যে কেউ সেটি পছন্দ কোরল না। যে ছবির জন্য মক্কেলরা লালায়িত হয় না ডুভিনের কাছে সে-ছবির কি মূল্য! ক্রমে ছবিটি তাঁর দু চক্ষের বিষ হোয়ে উঠল শেষেএকদিন তিনি তাঁর ম্যানেজারকে একটি কুঠার আনতে বোললেন, ছবিটি স্বহস্তে কেটে টুকরো টুকরো কোরবেন। ছবিটি যে বেরেনসেনের পছন্দসই একথা বারবার বোলে তবে তাঁর ম্যানেজার তাঁকে নিবৃত্ত কোরলেন। শেষ পর্যন্ত বেরেনসেনের এক ভক্ত ছবিটি বিক্রী কোরে দিল।

আর একবার, বেরেনসন যখন এ্যামেরিকায়, তাঁর এক ভক্ত নিউইয়র্কের এক ব্যাঙ্কার তাঁর সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন কোরেছিলেন। সদ্য-কেনা বট্টিচেলির একটি ছবি বেরেনসনকে দেখবার আগ্রহে অধীর হোয়ে গৃহকর্তা তাঁকে ছবিটির সামনে হাজির কোরলেন। কিছুক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে বি-বি বোললেন, "এটি-তো বট্টিচেলির আঁকা নয়। কোথা থেকে এটি পেলেন!"

"ডুভিনের কাছ থেকে," গৃহকর্তা উত্তর দিলেন, "তিনিও এই এলেন বোলে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুভিন হাজির হোলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বেরেনসন প্রশ্ন কোরলেন, "এটি যে বট্টিচেলির আঁকা এ-কথা আপনাকে কে বোলল?"

ডুভিন অনেক গণ্যমান্য সমালোচকের মত উল্লেখ কোরলেন। "তবু আমি বোলছি এটি বট্টিচেলির আঁকা ছবি নয়", বি-বি দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বোললেন। ডুভিন তৎক্ষণাৎ টাকা ফেরত দিয়ে ছবিটি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন ভোজ-সভা এরপর আর জমল না।

এই মতবিরোধের একটি ঘটনা অবশেষে একদিন মন-বরোধে দাঁড়ালেন এবং দু' জনের বহুদিনের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল।

শাঁসালো মক্কেল মেলনের জন্য ডুভিন এক লক্ষ পাউণ্ড দিয়ে জর্জোনের আঁকা একটি ছবি কিনেছিলেন। বেরেনসন সেবারেও আমেরিকায়। তিনি বেঁকে বোসলেন, বোললেন যে ছবিটি আসলে টিসিয়ানের আঁকা, তাও আবার টিসিয়ানের শিল্পীজীবনের প্রথম দিকে আঁকা। ডুভিন প্রমাদ গুণলেন। অনেক টাকা দিয়ে ছবিটি কেনা হোয়েছে এবং আর্টের জগতে টিসিয়ানের সঙ্গে জর্জোনের অনেক তফাৎ। জর্জোন ছিলেন টিসিয়ানের গুরু, তবে তিনি অল্পবয়সে মারা গেছলেন, সুতরাং তাঁর ছবি সংখ্যায় খুব অল্প। এদিকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ছবি এঁকে টিসিয়ান অনেক ছবি রেখে গেছেন। তাই বাজারে টিসিয়ানের চাইতে জর্জোনের দাম বেশি। এদিকে বেরেনসনের মতের বিরুদ্ধে কেউ ছবি কিনবে না, তাই ডুভিন বারবার বেরেনসনকে অনুরোধ কোরলেন তিনি যেন ছবিটি জর্জোনের আঁকা বোলে স্বীকার করেন। বেরেনসন এই মর্মে একটি নির্দেশ পেলেন টেলিগ্রামে এবং তিনও টেলিগ্রামে জানালেন যে তিনি কিছুতেই টিসিয়ানের

আঁকা ছবিকে জর্জোনের ছবি বোলে স্বীকার কোরে নিতে পারবেন না। এর পর মেলন ছবিটিকে ডুভিনের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। বোললেন, "এক গাদা টিসিয়ান কনে ঘর বোঝাই কোরতে চাই না, আমাকে একটা জর্জোনের আঁকা ছবি সংগ্রহ কোরে দিন।"

এরপর ডুভিন বেরেনসনের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে বেরেনসনের ছবি সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেও ছবির বাজার সম্বন্ধে বিচক্ষণতা ছিল না, এবং বাজারে বিচক্ষণতাই বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

তা বোলে কিন্তু একথা কোনোক্রমে বলা যায় না যে ডুভিন তাঁর মক্কেলদের শুভ চিন্তা কোরতেন না। তিনি মক্কেলদের টাকা নিতেই শুধু জানতেন না, তাঁদের পিছনে টাকা খরচ কোরতেও জানতেন। একবার তাঁর কাছ থেকে অনেকগুলি আর্টের জিনিস কেনার পরই রকফেলার নিউইয়র্কের বাইরে গেছলেন,—খুব সম্ভব এইগুলির জন্য টাকা সংগ্রহ কোরতে॥ তার পরই একদিন মিসেস রকফেলার রুদ্ধশ্বাসে ডুভিনের কাছে ছুটে এসে বোললেন যে তাঁদের বাড়িতে এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে; একটি ঝি এক ফুলদান ভেঙে ফেলেছে এবং সেটি ডুভিনের। ডুভিন মিসেস রকফেলারকে আশ্বাস দিয়ে ঠাণ্ডা কোরলেন, তারপর তাঁর সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ফুলদানটির অবস্থা দেখলেন। অবস্থা অবশ্য খুবই জটিল হোয়েছিল, কিন্তু তিনি মিসেস রকফেলারকে চিন্তিত হোতে বারণ কোরলেন। তিনি ভাঙা ফুলদানটি বাড়িতে এনে এক জাপানীকে লাগিয়ে দিলেন সেটি সারাবার কাজে। তাকে আদেশ দিলেন সে যেন দিনরাত খেটে রকফেলার ফেরবার আগেই কাজটি শেষ কোরে ফেলে। জাপানী তাঁর নির্দেশমতোই কাজটি নিখুঁতভাবে এবং ঠিক সময়েই শেষ কোরেছিল এবং রকফেলার ফিরে এসে ফুলদানটিকে পূর্ণাবয়বভাবেই স্বস্থানে অধিষ্ঠিত দেখেছিলেন। কিন্তু জাপানী ডুভিনের কাছে বিল দিয়েছিল সাড়ে সাত হাজার ডলারের। ডুভিনের ম্যানেজার ক্রয়েল যখন প্রস্তাব কোরল বিলটি মিসেস রকফেলারের কাছে পাঠিয়ে দেবার তখন ডুভিন রীতিমত স্তম্ভিত হোয়ে তাকে এই নৃশংস কাজ কোরতে বারণ কোরলেন।

শুধু যে তাঁর মক্কেলদের জন্যই ডুভিনের মনে একটু সদয় স্থান ছিল তা নয়। জার্মাণীর নামকরা শিল্প-সমালোচক এবং সেখানকার মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ডক্টর উইলহেল্‌ম্ ফন্ বোডে ডুভিনকে তাঁর প্রথম চিত্রসংগ্রহে সাহায্য কোরেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বোডের অবস্থা খুব খারাপ হোয়ে পড়ল। অর্থ নেই, রুগ্ন শরীর, তার উপর চোখের দৃষ্টি কমে আসছে। ডুভিনের কানে যখন খবর এল যে বোডে তাঁর শিল্পগ্রন্থের লাইব্রেরী নিলামে দিতে বাধ্য হোয়েছেন, ডুভিন দুজন লোককে পাঠিয়ে দিলেন খুব চড়া দামে তাঁরা যেন সেটি ডেকে নেয়, যাতে বোডে-র হাতে বেশ মোটা টাকা আসে এই দুর্গতির সময়। এই রকম ছিল তাঁর গোপন শুভানুধ্যায়িতা, পরোপচিকির্ষা, অন্তরালবর্তী সদাব্রত। (চলবে)

অভিজ্ঞজনে বলে : পুরোনো জিনিষ অর্থাৎ কিউরিয়ো, এ্যান্টিক ইত্যাদি কেনার নেশা, মদ্যপান অথবা রেস খেলার নেশার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়!

শিল্পী সুনয়নী দেবী | মালবী ঠাকুর

সহজ কথা যায় না বলা সহজে। সহজ কিছু সহজে করাই সব চাইতে শক্ত। সহজ বিষয়বস্তু সহজভাবে যিনি তুলির টানে মূর্ত কোরতে পারেন, শিল্পকর্ম তাঁর অতুলনীয়। শিল্পী হিসাবে তিনি প্রণম্য।

এমনি একজন শিল্পী আমাদের সুনয়নী দেবী। বার্ধক্যের বেলাভূমিতে সমাসীন হোলেও মন এখনো সজীব-সবুজ। তারুণ্যে মধুর। মাধুর্যে তরুণ।

বৃদ্ধ রসিকা। রসিকা বৃদ্ধা। জন্ম কবে জিজ্ঞাসা কোরলে বলেন, সন তারিখ অত-শত মনে নেই। এখন আমার বয়স হলো ৮৪ বৎসর। জন্ম সন হিসাব কোরে নাও তোমরা।

খানিকবাদে ভেবে বলেন, যতদূর মনে পড়ে তারিখ হোচ্ছে ৫ই আষাঢ়।

নিজের সম্বন্ধে এইটুকুই বোধ করি জানেন।

আমরাও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এর বেশি জানতে চাইনি। চাই না।

ঠাকুর পরিবারের মেয়ে, অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্রের বোন, বিখ্যাত ব্যবহারজীব রজনী চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী,—ইত্যাদি ব্যক্তিগত পরিচয়ের অনেক উর্ধ্বে সুনয়নী দেবী। আমাদের মতে তাঁর বড় পরিচয় তিনি শিল্পী, ভারতের অগ্রণী মহিলাশিল্পীদের অন্যতম। বর্তমান ভারতবর্ষের বর্ষীয়সী প্রশ্নিতযশা শ্রদ্ধেয়া মহিলা-শিল্পী।

আর্ট স্কুল, আর্ট কলেজ ইত্যাদিতে সাবেকি পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শেখেননি তিনি। এমন কি নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষকের কাছেও না।

বাঁধা-ধরা শিক্ষাপ্রণালীতে শিক্ষিত না হওয়ার একটা সহজ সুফল আছে, বোধ হয়। অধিকাংশ প্রতিভাই স্কুল-কলেজের চার দেয়ালের বাইরে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে বিকশিত ও পরিবর্ধিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর নজির সুপ্রচুর।

অশিক্ষিতপটুত্ব কথাটা তাই বড় তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক ধন্যবাদ এই কথার আবিষ্কারককে।

সুনয়নী দেবীর শিল্পীজীবন এই সুন্দর কথাটার মূর্ত প্রমাণ।

সুনয়নী দেবীর শিল্পীজীবনের সূত্রপাত একটু বেশি বয়সে। বিবাহিত জীবনে। প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।

সার্কুলার রোডে তখন থাকেন তিনি। বাড়িতে প্রায়ই একলা বসে থাকেন, ছেলেরা ছোট ছোট, স্কুলে চলে যায়। নির্জন-নিঃসঙ্গ জীবন।

আঁচেরা
আশ্বিন ১৩৫০ ভারতীতে প্রকাশিত

কি করেন? সংসারের কাজের পর রং তুলি নিয়ে বসেন। নির্জনতাই তাঁর প্রিয় সহচর।

কি আঁকবেন? প্রথমে অনুকরণ, তারপরে অনুসরণ। হাতের কাছে আছে প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা। এসব কাগজে সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। তাই দেখে দেখে আঁকবার চেষ্টা করেন।

চেষ্টা খুব ফলপ্রসূ হয় না। তাই নিজের মনে পেন্সিল দিয়ে, আবার কখনও কখনও তুলি আর রং দিয়ে যা ভালো ভাব মনে ওঠে, যা সুন্দর মনে হয়, তাই আঁকেন।

এমনি কোরে এগোয় শিল্পীর সাধনা। সাধনা ক্রমশ সিদ্ধির সমীপবর্তী হোতে থাকে।

দাদারা উৎসাহ দেন, প্রয়োজন হোলে সাহায্য করেন। তাঁর কথায়, ছোড়দা' (অবনীন্দ্রনাথ) একবার আঁকবার সময় ফিগারের মুখের কাঁধের মাপগুলো আমায় বোলে দিয়েছিলেন কোন্‌টা কতখানি হবে। তাঁরা বাইরে বসে আঁকতেন, আমি বাড়ির ভেতরে থাকতুম। আমার ছবিতে ওঁদের প্রভাব তো নেই। আমার ছবি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

তারপর খানিকবাদে, মনে হলো সঙ্গেদেই বোল্লেন, তখন শিখতুম যদি ওঁদের কাছে তাহলে ভালো হতো আরো।

হয়তো একহিসাবে হতো। কিন্তু সুনয়নী দেবীর আজকের শিল্পধৃত সহজ-সুন্দর আন্তররূপ কী পেতুম? বোধ হয় না।

উৎসাহ পেয়েছেন দাদাদের কাছ থেকে। যোগ্যতার উৎসাহ। তাঁর কথায়, দাদা (গগনেন্দ্রনাথ) বোলতেন, এরকম চোখ আর ভুরু কেউ আঁকতে পারে না। 'অর্ধ-নারীশ্বর' বোলে একখানা ছবি এঁকেছিলুম, পছন্দ হয়নি বোলে ফেলে দিতে যাচ্ছিলুম, দাদা বোল্লেন, ওটি আমায় দে। তখন জানতুম না অত ভালো হোয়েছে। মনে আছে একবার আমি ছোড়দাদাকে একটা ছবি দেখিয়ে ভালো হোয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করি। তার পর থেকে তিনি প্রায়ই অনেককে বোলতেন, সুনয়নী আমার কাছে সার্টিফিকেট নিতে এসেছিল, আমি দিইনি। নিজের সার্টিফিকেট নিজেই বের কোরেছে। ছোড়দা' বোলতেন, চোখ যখন ঠিক হবে তখন আপনিই বুঝতে পারবে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ।

রবীন্দ্রনাথও প্রশংসা কোরেছেন তাঁর ছবির। 'দান' বোলে তাঁর একটা ছবি রবীন্দ্রনাথের খুব পছন্দ হোয়েছিল। 'বিচিত্রা'য় ছবিটি প্রকাশিত হোয়েছিল এবং কবিগুরু তার ওপর একটা কবিতাও লিখেছিলেন।

রবি বর্মার ছবি অন্যান্য অনেকের মতো সুনয়নী দেবীকেও অনুপ্রেরিত কোরেছিল। বার্ধক্যের প্রান্তে এসে আজো তাঁর মনে পড়ে রবি বর্মার ছবি। তাঁর শিল্পী-জীবনের প্রাথমিক প্রেরণার উৎস।

। বীণাবাদিনী—বৎসরাধিক পূর্বে অঙ্কিত অপ্রকাশিত শেষ চিত্র।

রবি বর্মার ছবির বিষয়বস্তু ভারতীয় হোলেও বিদেশী প্রভাবান্বিত ছিল। এই বিদেশী প্রভাব থেকে ছবিকে মুক্তি দিলেন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীগণ। এবং সুনয়নী এই অনুসারীদের অন্যতমা।

সুনয়নীর ছবির বিষয়বস্তু কাছের জগৎ থেকে আহৃত। তাঁর কথায়, আমি এঁকেছি মা, ছেলে আর ঠাকুরদের ছবি। সরস্বতী, লক্ষ্মী, মহাদেব, রাধাকৃষ্ণ এই রকম সব। ল্যাণ্ডস্কেপ কখনো আঁকিনি। একবার ছোড়দা (অবনীন্দ্রনাথ) আমায় বোলেছিলেন, নানারকম আঁকো; যেমন পাখী,

বেড়াল, এই সব ; বড় একরকম হোয়ে যাচ্ছে। সেই শুনে একটা ঘোড়ার ছবি এঁকেছিলুম। ঠিক বোলতে গেলে ঐ তিন বিষয় ছাড়া কখন কিছু আঁকিনি।

অত্যন্ত সাদা-সিধা ধরনের বিষয়বস্তু তাঁর ছবির উপজীব্য। তার থেকেও সাদা-সিধে তাঁর প্রকাশভঙ্গী। অথচ কি সুন্দর !

সুনয়নী দেবী বলেন, আমি ছবির স্বপ্ন দেখতুম, স্বপ্ন দেখে ছবি আঁকতুম। আমার বেশির ভাগ ছবিই স্বপ্নে-পাওয়া ছবি।

এ যেন কোলরিজের স্বপ্নাবেশে কবিতা লেখা, স্বপ্নে-পাওয়া বিষয়বস্তুর স্বপ্নাবিষ্ট ছন্দ-রূপায়ন।

তাই তো মনে হয় দেশ-কাল পেরিয়ে শিল্পীতে শিল্পীতে

। মা যশোদা—ভাদ্র, ১৩২০ ভারতীতে প্রকাশিত।

নিরাভরণ সৌন্দর্যের বিশেষ একটা মহিমা আছে। সহজ সাধারণ সৌন্দর্যের তুলনা কোথায়?

সিফন-নাইলনের তীব্র উজ্জ্বল সৌন্দর্যের পাশে গ্রাম-বাংলার আটপৌরে লাল-পেড়ে শাড়ির স্নিগ্ধ শ্রী ও কল্যাণী লাবণ্যে যে সহজতা আছে, সুনয়নী দেবীর ছবিতে সে সহজতা বর্তমান।

মনোধর্মের কোথায় যেন একটা মিল থাকে। তাই নয় কি ?

সুনয়নী দেবীর ছবি, আগেই বোলেছি, বেশির ভাগই ঠাকুর-দেবতা, মা-ছেলে ইত্যাদি অবলম্বনে অঙ্কিত। তাঁর আঁকা কৃষ্ণের একটি ছবি মহীশূর আর্ট গ্যালারিতে আছে। ভগবতীর একটি ছবি লণ্ডনে বিক্রী হোয়েছিল। এ ছাড়া 'ভারতী' ও আরো কয়েকটা পত্রিকায় তাঁর ছবি বেরিয়েছিল।

বাজাওরে মোহন বাঁশী ?
সারা দিবস বিরহ-দহন দুখ,
মরমক তিয়াস নাশি—ভানু সিংহ

শ্রাবণ, ১৩২০ ভারতীতে প্রকাশিত

তাঁর সবচাইতে ভালো ছবি 'অর্ধনারীশ্বর'। তাঁর নিজের মতও তাই। তাঁর মেজ ছেলে মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় অন্যান্য ছবির সঙ্গে এই ছবিটিও বিলেতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ওখানকার প্রদর্শনীতে তা খুব প্রশংসা অর্জন কোরেছিল। তিনি বলেন, আমি নিজেই আশ্চর্য হোয়ে যেতুম কি কোরে আমার হাত থেকে এরকম ভালো ছবি বেরোল। আমি তো শিখিনি।

এমনিই বটে, এমনিই হয়।

অথচ এই ছবিই তিনি ভালো হয়নি মনে কোরে ফেলে দিচ্ছিলেন। ভাগ্যিস বড়দা গগনেন্দ্রনাথের চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা। গগনেন্দ্রনাথ বোলেছিলেন, ওটি আমায় দে। বুঝি এমনি কোরেই মহৎ সৃষ্টি বেঁচে যায়।

চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালে আমরা দেখি না। বিশেষ কোরে যখন বিদেশীরা দেখান, তখনই আমরা দেখে থাকি। এবং যখন দেখি তখন আবার তন্ময় হোয়ে দেখি।

সুনয়নী দেবীর প্রতিভা অনেকদিন সলজ্জ গোপনতায় চাপা ছিল। আমরা কেউই বিশেষ তাকে দেখিনি। দেখলেও এড়িয়ে গেছি।

ক্রামরিশ-ই প্রথম সুনয়নী দেবী সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি লিখেছিলেন, সুনয়নী দেবী শিল্পী পরিবারের মেয়ে। তাঁর কোনো কোনো সমধর্মী বহুকাল পূর্বে অজন্তার গুহায় ছবি এঁকেছিলেন, আবার তাঁর কোন কোন সমধর্মী আর কিছুকাল পরে ইটালিতে জন্মেছেন। যেমন মার্গারিটানে ডারেজ্জো এবং গুইডোডা সিয়েনা। এইসব সমধর্মীদের মধ্যে কেউ কারও অনুকরণ করেননি, এমন কি পরস্পরকে তাঁরা জানতেনই না। কিন্তু সৃষ্টির এমনই আশ্চর্য নিয়ম যে, মানুষের অন্তরের অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ ক্ষেত্র অবলম্বন কোরে চলে, তখন দেশকাল নির্বিশেষে তা একই রূপ ধারণ করে।

তিনি আরো লিখেছিলেন : সুনয়নী দেবীর নিজের অন্তরের মধ্যেই শিল্পীর সমস্ত ঐশ্বর্য আছে। তাঁর আর কিছু দরকার নেই। তিনি যদি তাঁর সেই ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের অধিদেবতার গোপন সংগীতে কান পেতে থাকেন, তা' হোলেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা আপনিই প্রকাশিত হোতে থাকবে।

ক্রামরিশের কথাগুলি যাথার্থ্যের সুরে অনুরণিত। সত্যই সুনয়নী দেবীর অন্তরের মধ্যেই শিল্পীর সমস্ত ঐশ্বর্য বর্তমান। এবং এই ঐশ্বর্যের অধিকারী বোলেই তাঁকে ছবি আঁকা

শিখতে হয়নি। অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণাতেই ছবি এঁকেছেন। ক্রাম্‌রিশের ভাষায়, তাঁর অশিক্ষিত সহজপটুত্ব অনায়াসেই রঙে রঙে ফোটে এবং রেখায় রেখায় গান কোরে উঠতে থাকে।

ঠিকই বোলেছেন ক্রাম্‌রিশ। আমাদেরও তাই মত।

এ প্রসঙ্গে যামিনী রায়ের কথা মনে পড়লো। শিল্পের বিস্তীর্ণ-বৃহৎ রাজ্য ঘুরে যামিনী রায় আশ্রয় গ্রহণ কোরেছেন বাংলার পটশিল্পে। অনেক পরিশ্রম, অনেক অনুশীলনের পর যামিনী রায় বাংলার পটশিল্পের সহজতাকে আত্মস্থ কোরতে পেরেছেন। সহজ কথা যায় না বলা সহজে। সহজ হোতে গেলে সাধনার প্রয়োজন। যামিনী রায়ের সহজতার পেছনে আছে দুশ্চর তপশ্চর্যার পরিশ্রমী ইতিহাস। কিন্তু সুনয়নী দেবী গোড়া থেকেই সহজ। তাঁর শিল্পীজীবনের পেছনে যামিনী রায়ের পরিশ্রম নেই। সুনয়নী দেবী অশিক্ষিতপটুত্বের অধিকারী, স্বয়ংসিদ্ধা তিনি। প্রথিতযশা পাশ্চাত্যশিল্পী আঁরি রুশোর নিকট আত্মীয়া। শিশু-চিত্তের অমেয় বিস্ময়ে ছবি এঁকেছেন, সেই বিস্ময়ে আবিষ্ট কোরেছেন চিত্রামোদীবর্গকে। আধুনিককালের সুপ্রবীণ সহজিয়া শিল্পী সুনয়নী দেবীর উদ্দেশ্যে আমাদের সেই বিস্ময়-মুগ্ধ শ্রদ্ধা-স্নিগ্ধ প্রণাম রইলো।

কাগজে নয়—
রং-এর ছড়াছড়ি আকাশ ময় !

টবেতে নয়—
ফুলের ছড়াছড়ি আকাশ ময় !

তারার কুঁড়ি,
আঁধার ফুঁড়ি,
রোমাঞ্চ হেন ফুটিয়া রয় !

কাগজে নয়, কাগজে নয়—
রং-এর ছড়াছড়ি আকাশ ময় !

রং ও তুলি
গিয়েছি ভুলি···
অবাক আঁখি, বুঁজিয়া রাখি।
বিস্ময় ! বিস্ময় !

কাগজে নয়, কাগজে নয়—
রং-এর ছড়াছড়ি আকাশ ময় !

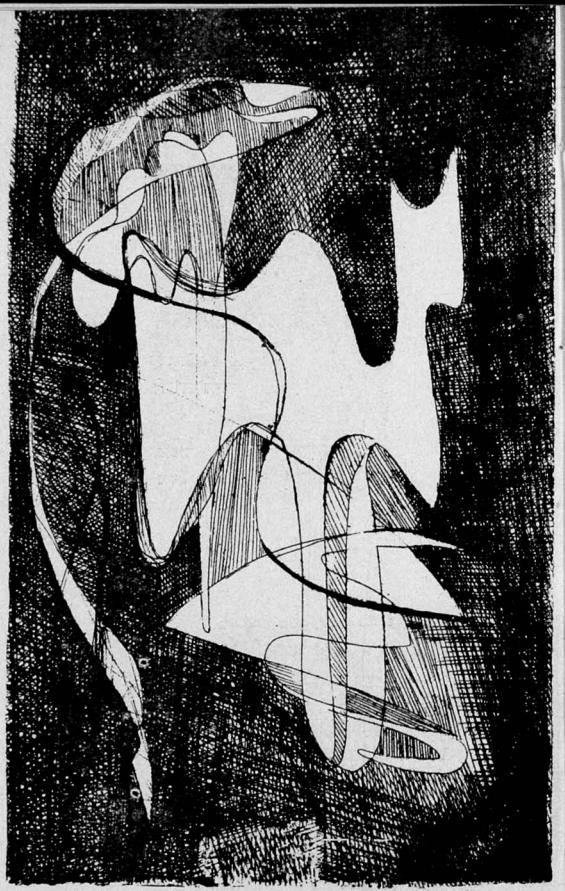

এচিং—আমিনা আহমেদ।

আমিনা আহমেদ

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে পাশ্চাত্য নির্বস্তুক শিল্পের পুরোধা শিল্পী শ্রীযুক্ত কান্দিনস্কী বোলেছিলেন : Painting is an art, and art is not a vague production transitory and isolated but a power which must be directed to the improvement and refinement of the human soul—to, in fact, the raising of the spiritual triangle.....That is beautiful which is produced by the inner need, which springs from the soul.

এই 'ইনার নিড' বা আত্মা-সমুত্থ প্রেরণা যার জন্মদাতা, তার শিল্পসৌন্দর্য সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। এবং যে কোন প্রসার্থক সুকুমার শিল্পের মূলেই এই প্রেরণা বর্তমান। কিন্তু সাদৃশ্যমূলক (রিপ্রেজেন্টেশনল) ছবির সঙ্গে নির্বস্তুক (নন্-রিপ্রেজেন্টেশনল) ছবির তফাত হোচ্ছে এই বিশেষ প্রেরণার প্রকাশভঙ্গী নিয়ে। প্রথম জাতের

ডাইভিং সোয়ান।

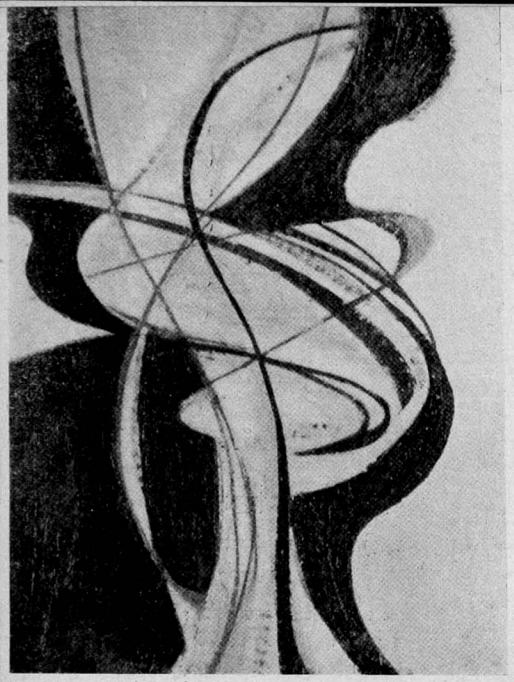

। মাউন্টেন স্ট্রীম।

ছবিতে প্রেরণা অনুভবেদ্য হয় কম, কারণ তা সমস্ত ছবিতে বিক্ষিপ্ত থাকে এবং ছবির বস্তু-সর্বস্বতা বা বস্তু-সৌসাদৃশ্যের বাহুল্যে এই প্রেরণা হারিয়ে যায়, চাপা পড়ে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবিতে এই আন্তর প্রেরণাই হয় সবখানি, বস্তু-সাদৃশ্য সেখানে অনুল্লেখ্য ও অপ্রয়োজনীয়। কয়েকটি রেখা আর বর্ণের সমাবেশে এই প্রেরণা ধরা পড়ে অভিজ্ঞ দর্শকের সতর্ক চোখে। যেহেতু শিল্পীর অন্তরের প্রেরণা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সহজ কোন বস্তু নয়, সেহেতু এজাতীয় প্রেরণাসর্বস্ব বস্তুনিরপেক্ষ ছবির দর্শক বিরলসংখ্যক। এই কারণেই দেশে-বিদেশে নির্বস্তুক শিল্প এখনো যথার্থ সমাদর লাভ কোরতে পারেনি, জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। এই কারণেই আমিনা আহমেদের নাম সাধারণ্যে এখনো অপেক্ষাকৃত অপরিচিত।

পিকাসো কান্দিনস্কীর তুলির দাক্ষিণ্যে বাস্তববাদরহিত শিল্প আজ ও-দেশে প্রতিষ্ঠিত এবং ও-দেশের চিত্রকলার ক্রমবিকাশে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

কিন্তু এ তো সেদিনের কথা। ভারতবর্ষে নির্বস্তুক শিল্পের ইতিহাস সুপ্রাচীন। ছবিকে আত্মার প্রতিচ্ছবি কোরে তোলা ছিল সনাতন ভারতের শিল্পর্ষিদের ধ্যানের বিষয়। আত্মার পরমাত্মা লাভের উপায়রূপেই শিল্পকে দেখতেন প্রাচীন ভারতের 'প্রতিমা'-কারগণ। ধ্যানের মাধ্যমে 'প্রতিমা' আবিষ্কার কোরতেন ঋষিরা, রেখা-মূর্তিতে তাকে মূর্ত কোরে তুলতেন শিল্পীর দল। বাহ্য জগতের রূপের সঙ্গে এই প্রতিমার চিত্রের বিশেষ কোন সাদৃশ্য থাকত না।

শিল্পসৃষ্টির যে মৌলে 'আত্মার কম্পন' বা 'ভাইব্রেশান ইন্ দি হিউম্যান সোলের' অস্তিত্বের প্রয়োজনের উল্লেখ কোরেছেন কান্দিনস্কী, ভারতবর্ষের শিল্প-সাধনার ইতিহাসে তা নতুন কিছু নয়। প্রকৃতির রূপের নিছক অনুকরণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ কান্দিনস্কী কোরেছেন, ভারতবর্ষে অনেক আগেই তা ধ্বনিত হোয়েছিল শুক্রাচার্যের কণ্ঠে—প্রত্যক্ষের দৃষ্টি নিয়ে রূপের সন্ধান মেলে না।

এক অদ্ভুত রূপে আমরা তাই খুঁজে পাই পঞ্চভূতের অধীশ্বর জগন্নাথকে, রূপের অদৃশ্য অন্তঃপুরে তাঁর স্বর্ণাসন পেতে রাখি। সামান্য একটি শব্দপ্রতীক হোলেও ওঁ তাই আমাদের দর্শন-শাস্ত্রের অলক্ষ্য গঙ্গোত্রী।

ভারতবর্ষের মাটিতে তাই নির্বস্তুক শিল্পীর জন্ম সহজ ও স্বাভাবিক। এবং এই কারণেই সত্তরের প্রান্তবাসী রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপাতেই এমন অনেক ছবি এঁকেছিলেন নির্বস্তুক শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে বিশ্বের শিল্পভাণ্ডারে যা চিরকাল রক্ষিত থাকবে। মানবাত্মার দুর্জয় অভিযানের শিল্প-প্রতীক হিসাবে যা দেশে দেশে নন্দিত হবে চিরদিন।

এবং এই কারণেই এই বস্তুতান্ত্রিক বিংশশতকের ভারতবর্ষেও আমিনার মতো সৎ শিল্পীর সাক্ষাৎ লাভ করি।

আমিনার প্রাথমিক শিল্পশিক্ষা জয়নাল আবেদীন এবং আনওয়ার হকের কাছে। কোলকাতার সরকারী শিল্প-বিদ্যালয় (অধুনা মহাবিদ্যালয়) থেকে উত্তীর্ণ হোয়ে কিছুকাল দিল্লী পলিটেকনিক স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। এবং তারপর ফরাসীদেশে যান অধিক শিক্ষার আগ্রহে। সেখানে পারীর অ্যাকাদেমী জুলিয়েঁতে শিক্ষালাভ করেন। এই সময় তিনি কান্দিনস্কীর নৈরূপ্যবাদের অন্যতম ধারক শিল্পী সিজার দোমেলার কাছে চিত্রশিক্ষা করেন। দোমেলার অন্যতম প্রিয় শিষ্যা তিনি। তাঁর সম্পর্কে দোমেলা বলেন :

'গোয়াশের কাজে আমিনার একটা অসাধারণ রকমের আধ্যাত্মিক ভাব-গভীরতা সত্যি লক্ষ্য করবার মতো। ও আমাকে বোলছিল এ ধরনের শিল্পরীতি ভারতীয় মননের ক্ষেত্রে নতুন নয়; ওর কাজে এই সত্যতার প্রমাণ পেলাম।

গোড়া থেকেই ওর রঙের নির্বাচনের শুদ্ধতায় মুগ্ধ হোয়েছি। পরিচয় পেয়েছি ওর সহজাত শিল্পক্ষমতার। ওর রেখাগুলি যেন নেচে বেড়ায়, ওর রং যেন গান করে।

আমিনা ফর্মের জগতে প্রবেশ কোরে বিশিষ্টরকমের স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেকে প্রকাশ কোরতে পেরেছে। ধৈর্য এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে ও কাজ কোরবে, সে কাজে থাকবে গভীরতা আর ঘনত্ব, যে গভীরতায় ফুটে উঠবে ওর আত্মিক প্রেরণার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। সমসাময়িক শিল্পীরা ওর কাজ থেকে এই নতুন চিত্ররীতির মননশীলতার সঙ্গে পরিচিত হবে।'

যে গভীর আত্মিক প্রেরণার সৌন্দর্যের কথা দোমেলা বোলেছেন, আমিনার ছবি ইতোমধ্যেই তার প্রমাণ দিয়েছে।

আমিনা আহমেদ চিত্রগুণশুদ্ধ এমন অনেক ছবি এঁকেছেন, যা তাঁকে ভবিষ্যতে একজন স্মরণীয় চিত্রকরের পর্যায়ে তুলে দেবে বোলে আমাদের বিশ্বাস। এবং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ছবি দেখতে অভ্যস্ত সাধারণের চোখের অনীহাকে এড়িয়ে এখনো যে তিনি নির্বস্তুক ছবি আঁকছেন, এই সততার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

আমিনা আহমেদের ছবি রূপে ভোলায় না, ভালোবাসায় ভোলায়। বিশুদ্ধ চিত্রের ও সজ্জন দর্শকের মধ্যে যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসায়। তাঁর 'রাজহংস', 'ডাইভিং সোয়ান', 'মাউন্টেন স্ট্রীম,' 'বার্ড এলাইটিং' প্রভৃতি ছবি সেই ভালোবাসার জীবন্ত রূপ-প্রতীক।

এ সব ছবি রেখার টানে এবং রং সংস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল। এদের বৈশিষ্ট্য বিষয়বস্তুতে নয়, বিষয়বস্তুর ইন্দ্রিয়াতীত আবেদনে। বস্তুর বিবিধ আকার নয়, বস্তুর অন্তঃশীল সর্বাত্মক চৈতন্যবোধ এদের মধ্যে সঞ্চারিত। তাই এরা এত মূল্যবান, এত উল্লেখ্যরকমের বিশিষ্ট। তুলির টানে আর বর্ণের লেপনে যে প্রাণস্পন্দন ফুটিয়ে তোলা যায় তার প্রমাণ রাজহংস, ডাইভিং সোয়ান বা বার্ড এলাইটিং। উদাহরণত, রাজহংসের বস্তুনির্ভর ছবি আঁকা আমিনার উদ্দেশ্য নয়, তাঁর দৃষ্টি বাস্তববাদী চিত্রকরের

বার্ড এলাইটিং।

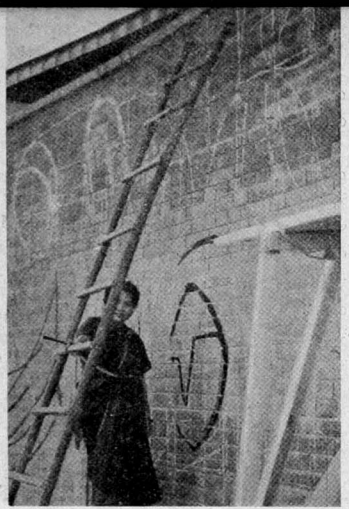

দেওয়ালচিত্র অঙ্কনরতা শিল্পী।

মতো রাজহংসের আকৃতি, মুক্ত ডানা বা তার সুন্দর গ্রীবাতেই আবদ্ধ নয়, প্রাণ-চঞ্চল একটি রাজহাঁসের আকৃতি-অতীত ছবি আঁকাই তাঁর প্রধান এবং প্রথম লক্ষ্য। রাজহাঁসের আকৃতি তিনি তাই একেবারে বিলুপ্ত করেন না, কিন্তু যে সৌন্দর্যময় গতিশীলতার আংশিক প্রতিফলন হাঁসের গ্রীবা এবং মুক্ত ডানায় সংক্রামিত, তাই তিনি ছবিতে কয়েকটি রেখা-রঙের সমন্বয়ে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেন। মুগ্ধ এই গতিশীলতার সবচেয়ে ভালো নিদর্শন পাই 'ডাইভিং সোয়ান' ছবিতে। নির্বচল ক্ষিপ্র রেখার নিপুণ বিন্যাসে এ ছবিতে যে প্রাণময়তা ও গতিশীলতা ফুটে উঠেছে তা এককথায় অসাধারণ। 'বার্ড এলাইটিং' নামে এচিং ছবিটি ও 'মাউন্টেন স্ট্রীম' নামক ছবি দুটিও এই ছন্দ-সহজ গতিশীলতায় বিশিষ্ট। আবর্তচঞ্চল জলস্রোতের

আমিনা অঙ্কিত মুর‍্যাল বা দেওয়ালচিত্র।

। পূর্বের মুর‍্যাল ছবিটির অপর অংশ।

বাঁধনহারা গতি কয়েকটি রেখার টানে আশ্চর্যভাবে মূর্ত হোয়ে উঠেছে শেষোক্ত ছবিতে। এ ছবি যেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র জীবন্ত চিত্ররূপ। সাহসী রেখা আর সংযত রঙের সার্থক সংস্থাপনায় শব্দের জগতকে কতখানি হৃদয়স্পর্শীভাবে উপস্থাপিত কোরে তোলা যায় তার যে প্রমাণ আমিনা আহমেদ দিয়েছেন, সাম্প্রতিক ভারতীয় চিত্রকলায় তার দ্বিতীয় খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে বোলেই আমাদের ধারণা। 'মাউন্টেন স্ট্রীমে'র সমান্তরাল চিত্র 'ওয়াটারফল'-ও সমধর্মিতায় উল্লেখনীয় ও প্রশংসাযোগ্য।

আমিনার তুলি নানাধরনের রঙের মৈত্রীতে ঐশ্বর্যবান। স্যাপগ্রীণ, ক্রিমসন লেক, লেমন-ইয়েলো, ব্ল্যাক, ক্রোম অরেঞ্জ, ওয়াইট, ব্লু এবং নানা জাতের গ্রে তাঁর তুলিকে সমৃদ্ধ কোরেছে। আমিনার রঙের ব্যবহার বাস্তবিকই মুগ্ধকর। একটি রঙের সঙ্গে আরেকটি রং যথাযথভাবে মেশাতে জানেন তিনি। রঙের এই হার্মনি-সৃষ্টি করার দুর্লভ ক্ষমতায় তাঁর চিত্রাবলী প্রশংসনীয়ভাবে বিশিষ্ট। তাঁর রং যেন কথা বলে। কথা বলে আর গান করে। রঙের ঐকতান গভীরতায় কত সুদূরপ্রসারী হোতে পারে তা তাঁর ছবির দর্শকমাত্রেই জানেন। শুধু রঙের কুশলী বিন্যাসে যে একটি আশ্চর্য অর্থবহ ছবি গড়ে তোলা যায়, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম তাঁর 'অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন ব্লু' ছবিতে।

ব্রিক-রিলিফ বা মুর‍্যাল-পেইন্টিংস-এও আমিনা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পারীতে অবস্থানকালে তিনি দোমেলার কাছে ছাঁচে ঢালাই ধাতু, কাঠ ও অন্যান্য দ্রব্য সহযোগে ব্রিক রিলিফ ও নানাধরনের রূপ-সজ্জার কাজ শিখেছিলেন। তাঁর এই শিক্ষার সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৫৫ সালের ইণ্ডাষ্ট্রিজ ফেয়ারের ব্রিক-রিলিফে। তার চাইতেও সুন্দর হোয়েছিল হাণ্ডলুম প্যাভিলিয়নে আঁকা দেয়ালচিত্র। রেখার সাহায্যে আঁকা বয়নরতা কয়েকটি নারীমূর্তি ছিল এই ছবির উপজীব্য। এ ছবি সম্পর্কে জনৈক সমালোচক মন্তব্য কোরেছিলেন : Feminine forms weave and seem to move through the space that bands round the central ramp. Here line as a boundary has become a mere symbol of expression of the most essential representation. It is a condensed abstract of the subject itself, for these essential qualities are connected neither with the surface, nor with the

substance of the thing ?—সমালোচকের এ মন্তব্যে ছবির চরিত্রধর্ম সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

আমিনা আহমেদ এ-কালের অন্যতম অগ্রণী নির্বস্তুক শিল্পী। অধ্যাপক এগন ভিয়েটার মতে তিনি ভারতীয় নির্বস্তুক শিল্পীদের মধ্যে সবচাইতে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। আমাদের মতে চিত্রগুণশুদ্ধতায় আমিনার ছবি গুণীজনের কাছে একদিন যথার্থ মূল্য পেতে পারে। এবং এই শুদ্ধতা ও সৌকুমার্যে তাঁর ছবি সংগীতের সমধর্মী। তাঁর ক্যানভাস শুভ্র-নিটোল গীতি-নৈবেদ্য, তাঁর কোন কোন ছবি সিম্ফনীর সমান্তরাল। তাঁর ছবিতে উদ্দামতা নেই, আছে শান্ত হৃদয়ের স্নিগ্ধ নির্লেপ। তাঁর জন্ম ভারতের মাটিতে, ভারতীয় ঐতিহ্যসুলভ অ্যাবষ্ট্রাকশান তাঁর ধমনীর রক্ত-ধারায়। তাঁর অন্যতম শিক্ষা য়ুরোপীয় অ্যাবষ্ট্রাক্ট আর্টের উদয়ভূমি পারীতে। শিক্ষক সিজার দোমেলার কাছে তিনি শিখেছেন চিত্রাঙ্কনগত শৃঙ্খলা ও সংযম। ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত ও নব পারীতে শিক্ষিত আমিনার ছবি তাই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য চিত্রকলার সার্থক সমন্বয়ের ফলশ্রুতি। তাঁর ছবির বিষয়বস্তু দেশজ। ভারতীয় পুরাণ-গাঁথাও তাঁর ছবির উপজীব্য। পৌরাণিক গরুড়ও তাই তাঁর ছবিতে কল্পনার রঙে-রসে অভিসিঞ্চিত হোয়ে জীবন্তরূপে প্রতিভাত হয়। পশ্চিমী চিত্রশৈলীর আশ্রয় নিলেও চরিত্র-ধর্মে তাঁর ছবি মূলত ভারতীয় শিল্পীর সৃষ্টি বোলেই মনে হয়।

আমিনা আহমেদের ছবি চিত্রগুণে দেশজ ও দেশোত্তর। তাঁর ছবিতে দেশ ধরা দিয়েছে, অথচ সে ছবি দেশকে অতিক্রম কোরেছে। তাঁর ছবি একালের অথচ তা কালকে জয় কোরতে পেরেছে। দেশকালাতীত অপরিবর্তনশীল এক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আমিনা আহমেদের ছবিতে মানব-হৃদয়ের অরূপ রতনের জন্য যে চিরন্তন ব্যাকুল অন্বেষা ফুটে উঠেছে রেখার টানে ও রঙের পেলবতায়, তার নিদর্শন সাম্প্রতিক ভারতীয় শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে দুর্লভ।

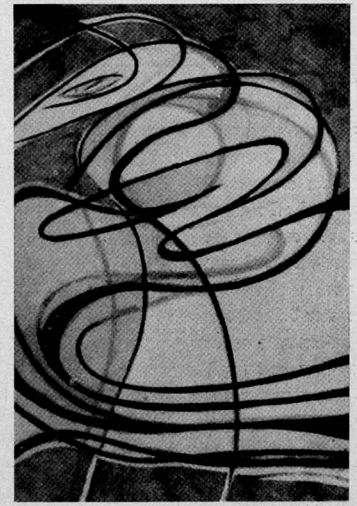

। রাজহংস।

শিল্পী তার তুলি আর রঙের সাহায্যে পটের ওপর আলেখ্য রচনা করেন। অভিজ্ঞতার রসে সিক্তি একটি রূপ, দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরেন।

প্রত্যেক ছবির একটি অন্তর্নিহিত ভাব আছে—রং, রেখা

শিল্পী সুধা মুখার্জি

বিশ্বনাথ চৌধুরী

আর আলোছায়ার বিচিত্র রূপ নিয়ে পটের উপর তা পরিস্ফুট হয়। কারণ, ছবি তো শুধু পটের উপর লেখা মাত্র নয়—যে কোন ক্ষমতাপন্ন চিত্র শিল্পীর শিল্পকীর্তি মনের গভীরেও লেখার দাগ এর চেয়েও যে গভীরতর রেখা রেখে যেতে সমর্থ! শিল্পীর দৃষ্টির সঙ্গে রসজ্ঞ দর্শকের নতুন কোরে দৃষ্টি বিনিময় হয়—দর্শক শিল্পীর সৃষ্টিকে উপলব্ধি কোরে রসাস্বাদ গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। শিল্পী তাকে দৃশ্যমান জগতের বাহ্যবস্তুর অন্তর্লোকে প্রবেশ করার নিশানা দেন, ভিতরকার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি কোরতে সাহায্য করেন। এইখানেই শ্রেষ্ঠ চিত্রের সার্থকতা। রসোত্তীর্ণ চিত্র হিসাবে বিদগ্ধ মনের স্বীকৃতি পাওয়া তখনই সম্ভব হয়।

রঙের ব্যঞ্জনা, রেখার বলিষ্ঠ উচ্চারণ অথবা আঙ্গিকের দিক দিয়ে বিদেশী শৈলীর অনুকরণ কোন ছবিকে বৈচিত্র্য দিতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণতা দেয় না।

ছবির বিষয়বস্তু, উপাদান ও প্রয়োগনৈপুণ্য যদি একটি অখণ্ড সমগ্র রূপ প্রকাশ করে তবেই সে ছবি সার্থক চিত্র হিসাবে সুধীজনের সমাদর লাভ করে। শ্রীমতী সুধা মুখার্জির কয়েকখানি ছবি সার্থক চিত্র হিসাবে সমাদর পাবার যোগ্য। শ্রীমতী মুখার্জির চিত্রশালা দেখে বার-বার এই কথাই মনে হোয়েছে চিত্রের বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপটি তিনি যেন আবিষ্কার কোরেছেন, অবাস্তবকে অনুভূতির সাহায্যে বাস্তব রূপ দিয়েছেন,—তাঁর রং আর রেখার মায়াজাল লীলায়িত ছন্দে মূল রূপটিকে প্রকাশ কোরছে।

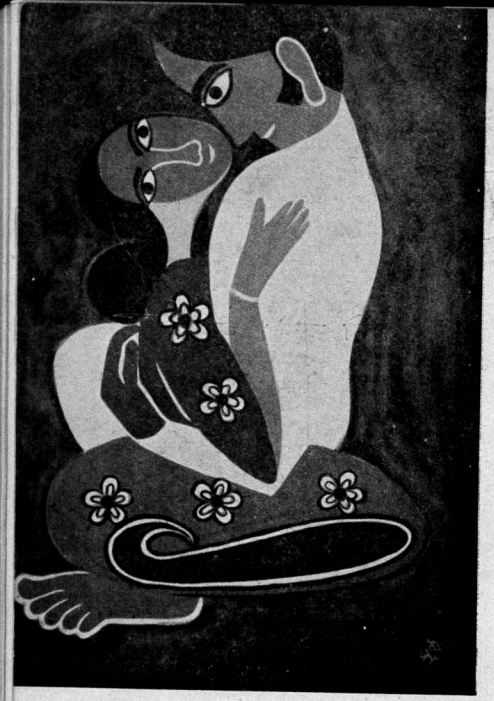

প্রেমিকযুগল।

গতানুগতিক রীতিতে অনভিজ্ঞ হোলেও রং আর রেখার দুরন্ত উচ্চারণে তাঁর দুঃসাহস ঘোষণা দর্শককে বিস্ময়াভিভূত না কোরে পারে না। তাঁর স্বাধীন অবাধ গতি-ছন্দ ছবির রঙে আর রেখায় বিস্তারিত। নিঃসংকোচ ভাব প্রকাশের সহজতায় তিনি সদাই যেন স্বাভাবিক।

তাঁর নিষ্ঠা ও সাধনা দৃষ্টিকে একাগ্র কোরেছে। বিষয়-বস্তুর অন্তর্লোকে প্রবেশ কোরে তার নিগূঢ় অর্থটি তিনি আবিষ্কার কোরতে পেরেছেন—তাঁর ব্যঞ্জনার মধ্যে এই বিশেষ অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হোয়েছে—শিল্পী যা বোলতে চান আমরা যেন কতকটা বুঝতে পেরেছি। শিল্পীর রসানুভূতির সঙ্গে দর্শকের রসাস্বাদনের যোগসূত্র যেন পরস্পরকে কাছে টেনে নিয়েছে।

এই সহজিয়া শিল্পকীর্তির নেপথ্যে যে সচেতন মনটি কাজ কোরে যাচ্ছে তার পরিচয় আমরা তাঁর লেখার মধ্যেই পাই। শ্রীমতী মুখার্জি নিজের চিত্র সম্পর্কে বলেন: "ছোট-বেলা থেকেই সংগীতের প্রতি আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। পরবর্তীকালে সংগীতে থেকে ললিত কলার দিকে আকর্ষণ বেড়ে যায়। অন্তর থেকে প্রেরণা পেয়েই আমি চিত্রকলার দিকে মনোনিবেশ করি।

"এখন কোন সংগীত শুনলেই একটা রঙের ছায়া চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই ছায়া যেন বৃত্তাকারে কিংবা জ্যামিতিক কোণ-আকৃতি নিয়ে দ্রুতগতিতে চোখের সামনে ঘুরতে থাকে, আর তার ভিতর থেকে ক্রমশ একটা মূর্তি পরিস্ফুট হোতে থাকে। তা কোনো সচেতন প্রচেষ্টা বা উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত নয়। আমার মন যখন সেটা গ্রহণ করে, তখনই একটা ভাব আকারে পরিণত হয়।

"মূর্তি তার সঙ্গে পরিবেশ নিয়ে আসে,

ছাগলিওয়ালি

খেলাঘর।

আনে তার বিস্তারের জন্যে স্থান এবং পটভূমিকা। আমি তখন এর সঙ্গে আমার অনন্যতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করি।

"আমার কাজের মধ্যে যদি আমার আমিত্ব প্রকাশ করার অভিপ্রায় থাকে তবে সেটা কম লজ্জার কথা নয়। সুতরাং আমার কর্তব্য হলো নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ভুলে যাওয়া।

"আমি জীব এবং বস্তুকে দেখি যেমন তারা চোখের সামনে পড়ে এবং বাহ্যিক আকৃতির পিছনে কি অর্থ নিহিত আছে তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করি।"

এই অনুসন্ধানের আগ্রহ নিয়ে সংকল্পের দৃঢ়তায় তিনি অগ্রসর হোয়েছেন। প্রকাশভঙ্গীর সরলতায় এবং বর্ণ-বিন্যাসের বিচিত্রতায় প্রত্যেক চিত্রের মধ্যে তিনি মূল সুরটি বহুলাংশে পরিস্ফুট কোরতে পেরেছেন।

তাঁর ছবির মধ্যে ক্ষণিকের জন্য তাঁর সহজ সরল ভাবই পটুয়াদের কথা হয়তো স্মরণ করাতে পারে কিন্তু আদতে ঐ সহজিয়া সরল প্রকাশভঙ্গী ভিন্ন তাদের সঙ্গে আর কোনোরূপ মিল আছে বোলে তো মনে হয় না। খুসীর মেজাজে যেন তিনি রং আর তুলি নিয়ে খেলা কোরছেন। তাঁর অনুভূতির রাজ্যে শিশু-স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দের উচ্ছলতায় যে সৃষ্টির মায়াজাল তিনি রচনা কোরতে চেষ্টা কোরেছেন —তা রং আর রেখার আনন্দিত ছন্দে তাঁর প্রত্যেক ছবিতে প্রকাশিত।

তাঁর চিত্রগুলির মধ্যে 'টয়লেট' অথবা প্রসাধন চিত্রটি শিল্পনৈপুণ্যে ও বর্ণবিন্যাসে স্বকীয় বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর হিসাবে এ ছবিটির মূল্য কম নয়। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বপ্নরাজ্যের ঐশ্বর্য অনেকাংশে চোখের সামনে তুলে ধরতে চিত্রটি সক্ষম। শতাব্দীর অবলুপ্ত সভ্যতার বিস্মৃত পরিবেশ মনকে অতীতের প্রচ্ছন্ন যুগে নিয়ে যেতে যেন প্রলুব্ধ করে।

দর্শকমনে এই প্রভাব বিস্তারের কৃতিত্ব—সত্যকার

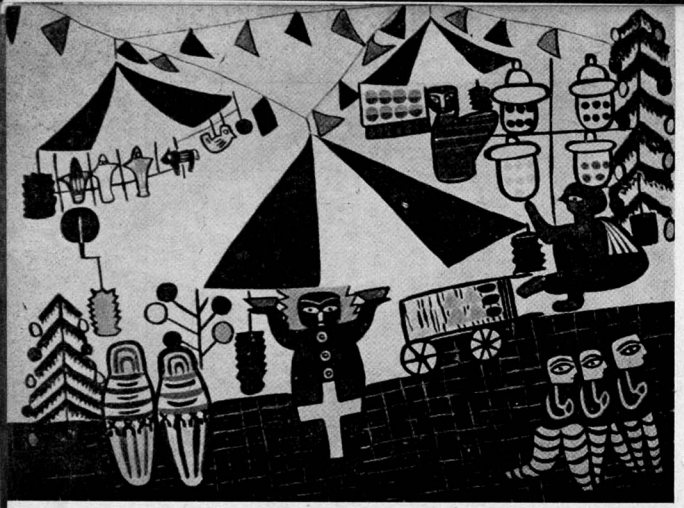

বড়দিনে
নিউমার্কেট।

প্রসাধনে।

ম্যাডোনা
বা
মাতৃমূর্ত্তি।

শিল্পসৃষ্টির একটি বিশেষ গুণ—এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

রঙে রেখায় নিরাভরণ সারল্যের সরল ভঙ্গিমায় ছবিটি অনবদ্য হোয়ে উঠেছে।

'ছাগলীওয়ালী' চিত্রে শ্রীমতী মুখার্জি গতির ছন্দ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। পিছনের দিকে দোলায়মান গতির রেশ এবং ছাগলীর বাঁকানো গ্রীবাভঙ্গীর বক্রতায় গতির ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হোয়েছে। ছাগলীওয়ালীর চোখ দুটিতে যেন স্বপ্নের রেশ আছে। গ্রামের সুশীতল ছায়ার স্নিগ্ধ পরিবেশে উন্মনা মন যেন কিসের স্বপ্নে বিভোর। এমন সরল সুন্দর ছবি সহজে চোখে পড়ে না।

'বড়দিনের বাজার' চিত্রটিতে সাজসজ্জা সমারোহ ও উৎসবচঞ্চল নরনারীদের একটি বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে। শিল্পীর সজাগ দৃষ্টি রং ও রেখার সমন্বয়ে একটি সার্থক সমগ্র

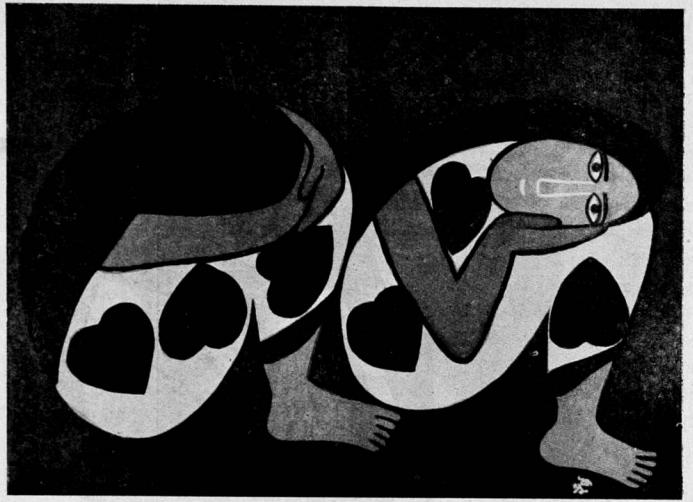

←——তৃপ্তি বিনোদন

ঘোমটার ফাঁকে।

রূপ প্রকাশ কোরছে এখানে। গতির চঞ্চলতা তুলির টানে মাত্র কয়েকটি রেখায় বিচিত্রভাবে প্রতিফলিত। বড়দিনে নিউমার্কেটের রূপসজ্জা যারা চোখে দেখেছেন তারা সহজেই উপলব্ধি কোরতে পারবেন দ্রব্যসম্ভারের বর্ণবৈচিত্র্য, দোকানীর জাঁকজমক, ক্রেতার ব্যস্ত মনোভাবকে শিল্পী কি আশ্চর্য দক্ষতায় সামান্য কয়েকটি রেখার টানে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার সঙ্গে মূল সুরটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে।

নববধূর সলজ্জ ভাবটি 'ঘোমটার ফাঁকে' ছবিটিতে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট। যৎসামান্য বলিষ্ঠ রেখার বিচিত্র ভঙ্গীতে যেন একটি সমগ্রভাব প্রকাশ পেয়েছে।

শিল্পীর সৃজনধর্মী মন অনুশীলনের প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম কোরে নতুনের দিকে দৃষ্টিপাত কোরেছে। অন্বেষনের ঐকান্তিক আগ্রহ তাঁর সাধনাকে একাগ্রতার প্রেরণা দিয়েছে। একথা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায় ঘোমটার ফাঁকে ও ম্যাডোনা 'মাতৃ-মূর্তি' চিত্র দুটি লক্ষ্য কোরলে।

সৃষ্টির দিক দিয়ে চিত্র দুটি প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষররূপে স্বীকৃতি লাভ কোরতে সচেষ্ট—একথা বলা হয়তো অসংগত হবে না। ম্যাডোনা চিত্রে স্নেহময়ী মাতৃত্বের স্নিগ্ধ রূপ সরল রেখার টানে মূর্তি লাভ কোরেছে। প্রকাশের আবেগে মাতৃত্বের

←——অবসর যাপন

যে ভাবটি শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন, তা শুধু অনবদ্য নয়, আশ্চর্য রকমের হৃদয়গ্রাহীও বটে। শ্রীমতী মুখার্জির অঙ্কন পদ্ধতির সঙ্গে চিরাচরিত লোকশিল্পের সহজ অঙ্কন-আঙ্গিকের সামান্য মিল থাকলেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তা স্বতন্ত্র।

রঙ আর রেখার সমাবেশে শিল্পী তাঁর মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে এটা কম কথা নয়। শ্রীমতী মুখার্জি তা পেরেছেন এবং সেই জন্যেই তিনি সব দিক দিয়ে অভিনন্দন পাবার যোগ্য। অবিশ্যি তাঁর ছবিগুলির রঙিন প্রতিলিপি না দিতে পারায়—লেখায় এবং একরঙা প্রতিলিপিতে শতাংশের একাংশেও পাঠকরা অনুভব করতে যে অক্ষম হবেন একথা সুনিশ্চিত।

স্থানাভাব হেতু এখানে প্রকাশিত চিত্রগুলির মধ্যে থেকে মাত্র কয়েকটি চিত্রের রূপ বিশ্লেষণ দেওয়া সম্ভব হলো।

এই রচনার রেখাচিত্রগুলি লেখকেরই আঁকা। লেখক যখন বীরভূমের গ্রামে-গ্রামে রং তুলি নিয়ে রূপ ও রেখার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন,তখনই বাউলদের গ্রামে অবস্থান-কালীন তাদের জীবন-যাত্রার সংস্পর্শে আসার পর সরাসরি এই রেখাচিত্রগুলি জন্ম নেয়।

বাউল

পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে বাউলদের একটা বিশিষ্ট স্থান বর্তমান। বাংলার সংগীতে বাউল সম্প্রদায়ের দানের কথা আজ আর নতুন কোরে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই বাউলদের সম্বন্ধে সম্যক্‌ভাবে কেউই বিশেষ অবগত নন, বিশেষ কোরে যাঁরা শহরে থাকেন।

বাউল হলো এমনই এক ধরনের মানুষ যাদের জীবনই হলো গান। তাদের জীবন নিয়ে আলোচনা কোরলে দেখা যাবে গান বাদ দিলে তাদের আর বিশেষ কিছুই থাকে না। গানের ভিতর দিয়ে তাদের ভাব, ভাষা ও স্বরূপের প্রকাশ। এই বাউলদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেশার সৌভাগ্য আমি লাভ কোরেছি। এদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করবার সুযোগ ঘটেছে আমার। এর কোন চিত্র-চরিত্র তাই ভাবপ্রবণ ও কল্পনা-প্রসূত নয়। এই বাউল সম্প্রদায়ের সমাজজীবন সম্পর্কে সাধারণের পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যে 'সুন্দরম্'-এর সংগীত বিভাগে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শস্যশ্যামল বাংলাদেশের একপ্রান্তে রাঙা মাটির দেশ বীরভূম ধ্যানী ঋষির মতো বসে আছে দীর্ঘকাল। তপঃক্লিষ্ট এর মাটিতে আবির্ভাব ঘটেছে বহু মনীষীর, বহু মহাপুরুষের। বহু কবি, বহু সংগীতজ্ঞ এর আকাশ-বাতাস ভরে

নৃত্যরত বাউল।

তুলেছেন তাঁদের কবিতায়, তাঁদের গানে। বীরভূমের আকাশ গানের আকাশ, বীরভূমের মাটি গানের মাটি। তার গেরুয়া মাটি তার মনোজীবনেরই প্রতীক। উদাস-করা হারিয়ে-যাওয়া গানের সুর বীরভূমের লোকসংগীতের মৌলধর্ম। এই বিশিষ্ট সংগীতপ্রবাহের অন্যতম ধারা বাউল গান—বাউল সম্প্রদায়ের প্রাণসংগীত। বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের প্রধান মিলনভূমি হলো রাঙা মাটির

যাই হোক, বাউলরা সত্যিকারের কিছুরই আশা ভরসা রাখে না। ওরা সকল পাশ থেকে মুক্ত। সকল বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন। বাউলরা কিন্তু সত্যিকার খুব মজার মানুষ। দেখতে শুনতেও এক অদ্ভুত রকমের, গাল-ভরা দাড়ি, মুখ-ভরা গোঁফ, মাথায় সুদীর্ঘ কেশরাশির চিক্কণ চূড়া। কোনটি সোজা, কোনটি বাঁকা, কোনটি তির্যক। গায়ে নানান ধরনের ছিটে ফোঁটা রং-বেরংএর ছিট্ কুড়িয়ে কুড়িয়ে, তারই জোড়া-দেওয়া আপাদলম্বিত আলখাল্লা, কাঁধে ভিক্ষের ঝোলা ও একতারা, হাতে কিস্তি, (কিস্তি হলো বড় নারকেলের মালা বা খোলের তৈরী ভিক্ষার পাত্র) পায়ে নূপুর, কপালে ও দুই বাহুর ওপরে খড়িমাটির তিলক। সব মিলিয়ে বেশ একটা অদ্ভুত ও বিচিত্র রকমের পরিবেশের সৃষ্টি। এদের এই বাইরের দৃশ্য দেখলে হয়তো কেউ তত রস বা মজা নাও পেতে পারেন। কিন্তু ভিতরটা রসে ভরপুর। এদের ভিতরের

লোকটি রসের সাগর। তাই আবার ক্ষ্যাপা বাউল গায়ঃ

'ওরে, মজার মানুষ এসেছে দেশে
দেখবি যদি আয়।'

তা এই রকম মজার মানুষ মানে বাউলরা বীরভূমের মাঝে ছেয়ে আছে। এখানকার নানান জায়গা জুড়ে যেমন রয়েছে তীর্থস্থান, পীঠস্থান, তেমনি বাউলদের আখড়ায় আখড়ায় ভরে আছে এই পুণ্যভূমি ও মনীষীদের লীলাভূমি বীরভূম। হিসেব কোরলে দেখা যাবে যে ন্যূনপক্ষে শ' তিনেকের উপর আখড়া আছে এখানে। গোঁসাই বাউলের আখড়া এদেরই ভিতর একটি। হবিষে গাঁয়ের আখড়া, গোঁসাই বাবাজীর আখড়া নামেই পরিচিত। বাউলদের এখানকার লোকেরা বাবাজী নামে অভিহিত করেন। ভারি সুন্দর এই আখড়াটি। জায়গাটিও মনোরম। আর তার পারিপার্শ্বিক যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হোয়েছে সেটাও হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। হবিষে গ্রামটি ষ্টেশন থেকে যে খুব বেশি দূরে তা নয়। তবে হেঁটে যাওয়ার থেকে কোনো যানবাহনে যেতে পারলেই সেটি অপেক্ষাকৃত আরামের হয়। কারণ রাস্তাটির অবস্থা

ঘরের দাওয়ায় একটি বাউল।

দেশ এই বীরভূম—বাংলার ইতিহাসবিখ্যাত 'বীরের ভূমি'।

বাউলরা হলো বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই এক অংশ। এদের গানই হলো জীবনের সব কিছু। সারা দিন ভগবানের নাম-গান কোরে তদুপার্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের গানের ভিতর যেমন স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য আছে তেমনি এদের প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যেও একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। চলা-ফেরা, কথাবার্তা, ওঠা-বসা, আচার-ব্যবহার লোক-লৌকিকতা প্রত্যেকটা জিনিসই স্বতন্ত্র। বৈষ্ণবদের যেমন কোন জাত নেই, এদেরও তেমনি কোন জাত নেই। শুধু জাত নয়, লাজ, কুল, মান, ভয় কিছুই নেই। তাইতো এক ক্ষ্যাপা বাউল গেয়েছেন: 'জাতি কুল মান সব গেলরে।'

হবিষা গ্রাম।

বাউলদের 'সামাজ' অথবা সমাধি।

সন্তোষজনক নয়। রাস্তাটি কিছু দূর সোজা গিয়েই ডান দিকে মাঠে নেমে পড়েছে। আর বর্ষাকালের মাঠের সেই চষা ভিজে মাটির বড় বড় ঢিবিগুলো রাস্তার দুপাশে উঁচু উঁচু হোয়ে আছে। যাত্রীরা প্রায়ই পাথরের মতো শক্ত শক্ত এই ঢিবিগুলোতে হোঁচট খেতে খেতে ক্ষত-বিক্ষত পায়ে আখড়ার দিকে চলে। আবার বর্ষার দিনেও এর ঠিক অনুরূপ অবস্থায় পড়তে হয় পথযাত্রীদের। মাঠের সেই চষা ভিজে মাটি একটু বৃষ্টির জল পেতে না পেতেই ভরভরে কাদায় পরিণত হয়। তারপর আবার যে জায়গার কথা বোলছি সেটি এঁটেল মাটির দেশ। মানে একটু বৃষ্টি হোয়েছে না হোয়েছে, অমনি, ব্যাস্,

গোঁসাই বাউল।

পায়ে এমনি ভক্তিভরে ধোরে থাকবে সে আর ছাড়তে চাইবে না। এই রকম দশায় পড়তে হয় বর্ষার দিনে প্রতিটি যাত্রীর। সুতরাং এর থেকে কোন যানবাহনে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। তবে আমি কিন্তু অন্য কোনো যানের থেকে পদব্রজে যাওয়ারই পক্ষপাতী। যাই হোক, এই ভাবে ষ্টেশন থেকে ঘণ্টা দেড়েক হাঁটলে, তবে ঐ হবিষা গ্রামে উপনীত হওয়া যায়। গোঁসাই বাউলের আখড়াটি

একটি ঘরে গোঁসাই বাউল ও তার মাতাজী (বৈষ্ণবী) দুই পুত্র ও এক কন্যাসহ থাকে। তার পাশের ঘরটিতে ঐ আখড়া দেখাশুনা করার জন্য অন্য একজন বাউল সপরিবারে বাস করে। আর একটিতে দৈনন্দিন কোনো অতিথি এলে তাদের থাকতে দেওয়া হয়। অন্যটি গোপালের ঘর; গোপাল মানুষ-গোপাল নয়, ঠাকুর-গোপাল। পিতলের একটি মাঝারি আকারের নাড়ু-গোপালের মূর্তি। তারই

নিদ্রাস্থবাবিষ্ট বাউল।

গ্রামের শেষপ্রান্তে অবস্থিত। আখড়ার সামনেই ছোট্ট একটি কাঁদর (কাঁদর হোচ্ছে বীরভূমেরই ছোটখাট নদীর শাখাপ্রশাখা স্বরূপ)। বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে আখড়াটি বিদ্যমান। চারপাশে বাঁশের কঞ্চির বেড়া দেওয়া। ভিতরে আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, কুল, বেল, বাঁশ, আঁকড় ইত্যাদি অনেক গাছপালা রয়েছে। এই ঘন বাঁশবনের নীচে ছোটখাট তিন চারখানি মাটির ছোট ছোট পোড়ো ঘর।

রোজ সেবা-ভোগ হয়। এই সেবার জন্য কিছু জমিও আছে। বহু পূর্বে এই আখড়ায়এ ক মোহান্ত ছিলেন। মোহান্ত হোচ্ছে বাউলেরই আর এক নাম। ঐ মোহান্তই নাকি গোপাল ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। আর তাঁর ইচ্ছাও ছিল যে এই আখড়ায় বসবাস কোরবে; তাঁকেই এই সেবাকার্য চালাতে হবে, আর আখড়ার তত্ত্বাবধান কোরতে হবে। ঐভাবে একজন যায় আবার তাঁর দেহরক্ষার

পর অন্য একজন আসে। এইভাবে অনেকের আসা যাওয়ার পর এখন বর্তমানে, গোঁসাই-ই এই আখড়ার মালিক। আখড়ায় ঢুকেই চোখে পড়ে গোঁসাই-এর ঘরের পশ্চিমে বেশ কতকগুলি বাউলদের 'সামাজ'। সামাজ হলো সমাধি। সমাধিকেই বাউলরা চল্‌তি ভাষায় সামাজ নামে অভিহিত করে। সমাধি নামের অপভ্রংশ। সব সামাজগুলিই মাটির তৈরী উঁচু ঢিবির মতো। কেবল দুটি সামাজই পাশাপাশি ইট দিয়ে বাঁধানো। এবং প্রায়ই তার সংস্কার হয় বোলে সব সময় নতুনের মতো দেখায়।

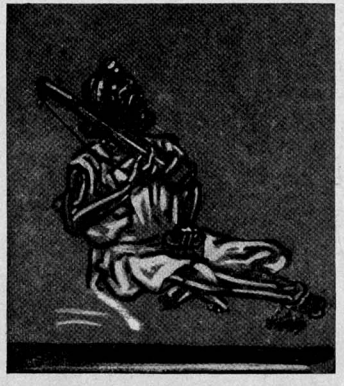

। একতারা হাতে বাউল।

পরে জানতে পারলাম যে ও দুটি আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা যে তারই, আর তার মাতাজীর। আখড়ার ভেতরে ছোটখাট পুকুরও আছে। সেই পুকুরে আখড়ার মাতাজীরা, মানে বৈষ্ণবীরা, স্নান করা, বাসন মাজা, রান্না করা এইসব কাজ করে। আর খাওয়ার জন্য ঐ কাঁদরের জলই ব্যবহার করা হয়। কারণ ঐ কাঁদরের জল সাধারণত পুকুরটির জল অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। গোঁসাই বাউলের ঘরটির ঠিক সামনেই একটি তুলসীমঞ্চ বিরাজমান। মঞ্চটি ইট দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু অনেকদিন সংস্কারের অভাবে তার প্রতিটি ইটের গা থেকে চুন-বালি বহুকাল হলো খসে পড়েছে। কতকাল যে ঐ অবস্থায় আছে তা বলা যায় না। এই মঞ্চটির নীচে চারিপাশে ঘিরে আছে বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে রং-বেরঙের বহু জাতের ফুলের গাছ। বোধ হয় গোপাল ঠাকুরের নিত্য সেবার জন্যই ওগুলির উপর এত যত্ন।

ঐ ধরনের ফুলের গাছ শুধু যে তুলসীমঞ্চের নীচেই আছে তা নয়, আরও দু-এক জায়গায় ইতস্তত দু-একটি গাছ রয়েছে। আর একটি বড় কাষ্টমল্লিকা ফুলের গাছ ঠিক গোঁসাই-এর ঘরের পাশেই সামাজের গোড়ায় কিছুটা জায়গা নিয়ে ডালপালা ছড়িয়ে বসে আছে। দেখলে মনে হয় সেও যেন আখড়ার ঐ সামাজগুলির দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। গরমের দিনে সে সামাজগুলিকে আতপ থেকে রক্ষা করে। আর বর্ষার সময় বৃষ্টি, ঝড়, ঝঞ্ঝা থেকে বাঁচায়, যাতে তাদের গায়ে একটুও কোন কিছুর আঁচড় না লাগে। হয়তো বা ঐ বাউলদের স্বর্গগত পূর্বপুরুষদের সব দিক থেকে শান্তি দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। গোঁসাইজীর সঙ্গে আমার আলাপ আজকের নয়। বেশ কিছু দিনের। একটা কথা, গোঁসাই বাবাজী অবশ্যি জন্মগত বাউল নয়। মানে, আসলে তার বাউল পরিবারে জন্ম নয়। প্রথমে সে জন্মগ্রহণ করে ঐ হবিষা গ্রামেরই এক বড় চাষীর গৃহে। তার বাল্যনাম হরেরাম লা। লা হলো লাহা নামের অপভ্রংশ। তাদের বাড়ির অবস্থা খুব ভালো। জমি জায়গাও বেশ কিছু ছিল। মানে এখনও আছে। তবে এখন আর তার নিজস্ব নয়, তার পরবর্তী বংশধরদের। ছেলেবেলা থেকে গোঁসাই খুব দুরন্ত ছেলে ছিল। বাল্যাবস্থায় সামান্য কিছু লেখাপড়াও শুরু কোরেছিল। তারপর বেশিদিন তা আর চলল না। চাষার ছেলের যা হয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই চাষে জুড়ে দিলেন তার বাবা। প্রথম যৌবনে তার বিবাহও হলো তাদের প্রথা অনুযায়ী। ছেলেমেয়েও হলো তিন চারিটি। প্রথম জীবনে গোঁসাই চাষবাস কোরে বেশ কিছু গুছিয়ে নিল। টাকাকড়িও কিছু জমাল। ছেলেমেয়েদের বিবাহও দিয়ে দিল। এখন সে মুক্ত। চাষের কাজকর্ম থেকে অবসর গ্রহণ কোরেছে। ছেলেরাই সমস্ত দেখাশুনা কাজকর্ম করে। এখন সে কেবল বাড়িতে একা বসে বসে ভাবে যে এইবার একটু শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঠাঁই পেলেই

বাউলদের আখড়া।

হয়। ঐ গাঁয়ের আখড়ার এক মাতাজী (বৈষ্ণবীদের এখানকার লোকেরা মাতাজী, বাউলদের বাবাজী নামে অভিহিত করেন) গাঁয়েতে ভিক্ষাকালীন গোঁসাই-এর বাড়িতে প্রায়ই ভিক্ষার জন্য যায়। গোঁসাই-এর বয়সও যে তখন খুব তা নয়, তবে বুড়োও বলা চলে না। চারের কোঠায় হয়তো সবে পড়েছে। মাতাজীর বয়সও তখন দুই পেরিয়ে তিনের কোঠার মত হবে। এই ভাবে প্রতি-নিয়ত মাতাজীকে দেখা ও আলাপ আলোচনার পর, হঠাৎ গোঁসাই একদিন বোলে বসলো ওকে, "এই আমাকে বাবাজী কোরে নিবি?" বোলতে ভুল হোয়ে গেছে, গোঁসাই-এর প্রথম স্ত্রী তখন অবর্তমান। আর মাতাজী তখন ঐ গ্রামের আখড়ায় অন্য বাউলের গৃহিণী। মাতাজীর নামটি ভারী সুন্দর। 'মহামায়া', দেখতে শুনতেও বেশ। শ্যাম উজ্জ্বলবর্ণা, দোহারা গঠন, উচ্চ গ্রীবা। কণ্ঠস্বর অপূর্ব। শুধু তার ঐ গ্রামে নয় সারা বীরভূম ও পশ্চিমবাংলার আরও নানাস্থানে গাইয়ে হিসেবে বেশ একটা নাম-ডাক তার আছে। গোঁসাই ওর নাম কি তা জানত না। জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে, তোর তোর, নাম কিরে বোষ্টমী?" বোষ্টমী হলো বৈষ্ণবী নামের অপভ্রংশ। বোষ্টমী বোলল, "আমি? আমার নাম মহামায়া।" —"মহামায়া! বাঃ বেশ নাম। তা সত্যি, মহামায়ারই অংশ বটে, তা নইলে কি এই বয়সে আমাকে কেউ এই ধর্মপথে টান ধরাতে পারে? যাক। একটা গান শোনা দিকি?—তোর গলাটি বাপু ভারী মিষ্টি। আহা, তাতো হবেই নামের গুণ্ তো—।" এদিকে মহামায়ার তখন যে মোহান্ত আছে, তারই ঔরসজাত একটি ছেলেও আছে। তার আগে বলা দরকার, এই মহামায়া বৈষ্ণবীর এরও পূর্বে সর্বপ্রথম ওদের বৈষ্ণবধর্ম ও শাস্ত্রমতে একবার বিবাহ হোয়েছিল। তবে সে স্বামী অবর্তমান। তবে তারও ঔরসজাত একটি ছেলে আছে। সে কথা তখন এ গোঁসাই (হরেরাম লা) জানত না। তবে এই মহামায়া কিন্তু স্বভাববৈষ্ণব। মানে বৈষ্ণব বংশেই ওর জন্ম। তবে বৈষ্ণবধর্মে, বিশেষ এদের এই বাউল সম্প্রদায়ে একাধিকবার বিবাহের প্রচলন আছে। গোঁসাই তাড়াতাড়ি ধড়মড় কোরে উঠে বোলল, "দাঁড়া, দাঁড়া দিকি, এক ছিলিম তামুক সেজে আনি।" গোঁসাই তামাকের খুব ভক্ত। বয়সটা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তামাকের নেশাটাও বেড়েছে।

। গঞ্জিকা উপভোগ রত বাউল।

এখন গোঁসাই (হরেরাম লা) সব সময় একাই থাকে। মেয়েটির বিবাহ দিয়েছে। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে সময় সময় আসে। আর ছেলেরা মাঠের কাজের জন্য সব সময়টুকু মাঠেই কাটায়। গোঁসাই তামাক সেজে ছঁকোটি ডান হাতে ধরে বামহাতে তামাকের কলকেটি নিয়ে সজোরে ফুঁ দিতে দিতে হন্তদন্ত হোয়ে মহামায়ার কাছে এসে ধপাস্ কোরে বসে পড়লো। তারপর মহামায়াকে উদ্দেশ কোরে বোলল, "নে ধর, একটা গান।" মহামায়া মাতাজীরও আবার তামাকের নেশার অভ্যাস আছে। মহামায়া একটু সলজ্জ-ভাবে বোলল, "দাঁড়ান গো। আমিও এক দম দিয়ে নিই।" গোঁসাই পকেট থেকে একটি কাঁচি সিগারেট বের কোরে ওর দিকে ছটাস কোরে ছুঁড়ে দিল। বোলল, "নে, গানটা গা—তারপর খেতে খেতে আখড়ায় যাস্।" মহামায়া সেটি আঁচলার ভিতরে সযত্নে রেখে, যেন কোন কিছুর চাপে নষ্ট বা ভেঙে না যায়, এইভাবে রেখে গোঁসাইকে লক্ষ্য কোরে

বাউলের হুঁকোয় মুখটান।

বোলল, "কি রকম গান শোনাব?" গোঁসাই একমুখ তামাকের ধোঁয়া ফু-ফু করে ছাড়তে ছাড়তে বোলল—"আরে বাবা গা-না—তোদের কত রকমের গান আছে। তুই ভালো দেখে একটা গা।" গোঁসাই চাষীপ্রধান লোক। পয়সা কড়িরও অভাব নাই। ধান-চাল বেশ আছে। সুতরাং তার সখও কিছু কিছু আছে। পোষাক-আশাকেও নজর আছে। তামাক, বিড়ি, সিগারেট এসবও আছে। আবার তার সঙ্গে গাঁজাও আছে। গোঁসাই বলে, "আরে গাঁজা না খেলে কি বরিগী হয়?" বরিগী হোলো বৈরাগী নামের অপভ্রংশ। বাউলরা গাঁজার খুব ভক্ত। যাই হোক, গোঁসাইএর তামাক শেষ না হোতেই মহামায়া মাথাটি একটু নীচু করে একতারাটি ডানদিকের কানের গোড়ায় দু'বার

তারে টোকা আর বামাতে দু হাত থাবড়ে নিয়ে, দুটোর সুর এক কোরে গান ধরল। একটি বহুদিনের পুরানো বাউলের রচনা করা গান।

মহামায়া গাইছে—

এসে গৌর লীলার বাজারে
অবাক যাই হেরে।
একটি ছুঁচের ছিদ্র মজার কথা রে,
ওসে পার করে গজোবরে (হরি, হরি)
পার করে গজোবরে—
অবাক যাই হেরে॥
এসে গৌর লীলার বাজারে
অবাক যাই হেরে॥
একটি আমড়া গাছেতে
জোড়া আম ধরে তাতে,
আবার আমের ভিতর জামের চারা ভাই
জাম ধরে তাতে।

* * * *

একটি সাপে নেউলে, একটি ইঁদুর বিড়ালে,
আবার একই বসত করে ভাই
একই মিশালে।
আবার তাই দেখে এক মড়া হাসেরে॥
ওসে হা-গৌরাঙ্গ রব করে।
ওসে হা-গৌরাঙ্গ রব করে।
অবাক যাই হেরে
এসে গৌর লীলার বাজারে
অবাক যাই হেরে॥

। ভোরের আলোয় উপবিষ্ট বাউল।

চলচ্চিত্র

অসীম সোম

শিল্পীর জীবন পিপাসা। 'কবিরে পাবে না তার জীবন-চরিতে'—এ কথা অনেকটা যথার্থ। শুধু জীবন-চরিতে কবি-পরিচয় আংশিক। কিন্তু যখন জীবন-চরিতের সঙ্গে পাশাপাশি তার কাব্যসৃষ্টিকে আমরা বিচার করি, তখন কবির পূর্ণাঙ্গ রূপের সন্ধান মেলে। তেমনি চিত্রশিল্পীর জীবনী জানতে হোলে তার চিত্রাবলীর প্রয়োজন। বরং তার জীবনদর্শন, তার সার্থক পরিচয় অনেকটা শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই নিহিত। কী পরিবেশে, কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করে, স্রষ্টার মনোভাবের কেমন অবস্থায় একেকটি ছবির সৃষ্টি তা জানা থাকলে, চিত্রবিশেষের রসাস্বাদনের পথ সুগম হয়। সেজন্য শুধু জীবনী ভিত্তিক ঘটনা সত্য নয়, তার সঙ্গে শিল্পকর্মের নিদর্শন যখন একত্র দেখার সুযোগ ঘটে, তখন সে সমন্বিত রূপ উপস্থিত হয় এক বিরাট আকর্ষণ নিয়ে। জন হাউস্‌ম্যান্ প্রযোজিত মেট্রো-গোল্ডেন-মায়ারের 'লাস্ট ফর লাইফ' চলচ্চিত্রটির সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই প্রাথমিক আকর্ষণ। বিশ্রুতকীর্তি ওলন্দাজ শিল্পী ভিনসেন্ত্ ভ্যান গখের যে জীবনকাহিনী আর্ভিং স্টোনের 'লাস্ট ফর লাইফ্' উপন্যাসে ভাষা পেয়েছে, তা-ই এ ছবির ভিত্তি।*

ভ্যান্ গখ্ এমন এক শিল্পী যিনি জীবিতাবস্থায় ব্যবহারিক জীবনের শান্তি ও সম্মানের কোন স্পর্শ পাননি, যার জীবনে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান, যার জীবন-পিপাসা কোন দিনই তৃপ্ত হয়নি, যার সমগ্র শিল্প-জীবনই আবেগ, কামনা ও উদ্দামতার এক বিচিত্র কাহিনী। অপার জীবন-তৃষ্ণাকে যেন এক প্রবল চেতনা ও দুর্জয় বাসনা সম্পৃক্ত কোরেই তাঁর শিল্পসৃষ্টি। তুলির আঁচড়ে ভ্যান গখ্ তাঁর জীবনতৃষ্ণাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। অঙ্কনের মধ্য দিয়ে আনন্দের সন্ধান পেলেও সাফল্য তিনি পাননি—অর্থাৎ নিজের একটি ছবিকেও তিনি বিক্রীত দেখে যাননি, বা সামান্যতম খ্যাতি-স্বীকৃতি শিল্পীমহলে বা রসিকসমাজে পাননি। প্রেম ছিল তাঁর জীবনে প্রয়োজন, অথচ প্রার্থিত নারীর কাছ থেকে এসেছে শুধু প্রত্যাখ্যান। গতানুগতিক জগতের কাছে যার জীবনের চরম মূল্য আত্মহত্যা কোরে দিতে হয়, সেই শিল্পীকে ভাবীকাল জগৎবরেণ্য কোরে নিয়েছে—এমন আশ্চর্য শিল্পীজীবনের তুলনা ইতিহাসে বিরল। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা ও তীব্রতা, বেদনা ও সাধনাকে ভ্যান গখ্ তুলে ধরেছেন তাঁর ক্যানভাসে—পরিচিতের প্রতিকৃতি দিয়ে, পরিবেশের প্রতিলিপি দিয়ে, প্রকৃতির প্রতিরূপ দিয়ে। তাঁর শিল্পকর্ম তাই এমন জীবনের ঘটনাবলীর ওপর

* ভিনসেন্ত ভ্যান গখের জীবনালেখ্য আর্ভিং স্টোন রচিত 'লাস্ট ফর লাইফ' উপন্যাসের চিত্ররূপ প্রসঙ্গে।

নির্ভরশীল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর তার অবস্থান। পোস্ট-ইম্‌প্রেসনিষ্ট্ শিল্পী হিসাবে ভ্যান্ গখের যেখানে সাফল্য সেখানে আছে তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে দৃষ্টিকোণের, বাস্তবতার সঙ্গে রসসংবেদনার ও শিল্পকর্মের সঙ্গে অদম্য জীবনকামনার সম্মিলন। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে তাঁর শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যে কামনার রূপায়ন, শিল্পীর নিজের ভাষায় তা হলো : "I want to paint humanity, humanity and again humanity."

ভ্যান্ গখের ঘটনাবহুল, করুণ, নাটকীয় জীবনকাহিনী বিস্ময়করভাবে রূপান্তরিত আর্ভিং ষ্টোনের 'লাস্ট ফর লাইফ' গ্রন্থে। তথ্য, ঘটনাসত্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে জীবনকাহিনীতে সাহিত্যরস সঞ্জীবিত করার এমন নিদর্শন বিরললভ্য। এমন একটি উচ্চাঙ্গ ও জনপ্রিয় সাহিত্যসৃষ্টির চলচ্চিত্রে ভাষান্তরে যে দায়িত্ব, তা পালনে অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও আয়োজনের বিশেষ ত্রুটি প্রযোজকেরা রাখেননি। পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ও প্রামাণিকের জন্য ব্যাপক বহির্দৃশ্য গ্রহণ, ভ্যান্ গখের মূল ক্যানভাসগুলির ব্যবহার—এ ছবির এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। ছায়াছবি নির্মাণে মূল গ্রন্থের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিস্ফুটনে কিন্তু আশ্চর্যরূপ রসবোধ ও পরিমিতিজ্ঞানের অভাবের ছাপ স্পষ্ট। তাই আকর্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আনন্দ এ-ছায়াছবি থেকে পাওয়া যায়নি।

নরম্যান ক্রোউইনের চিত্রনাট্য ভ্যান্ গখের জীবনের ঘটনাবলীর ঘাতপ্রতিঘাতকে বিচ্ছিন্নভাবে ধরতে পারলেও শিল্পীর অন্তশ্চেতনার যে অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-ব্যর্থতা-সংক্ষুব্ধ যে ক্ষত-বিক্ষত রূপ তাকে যেন মূর্ত কোরতে পারেনি। কার্ক ডগলাসের অভিনয়ও এ-ত্রুটির জন্য কিছুটা দায়ী। অবশ্য রূপসজ্জায় তার সঙ্গে ভ্যান গখের বেশ মিল আছে। ছায়াছবির বহু ঘটনার পরিবেশন বিচ্ছিন্ন; ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র কোরে ভ্যান গখের চরিত্রের যে বিশেষ দিকগুলি পরিস্ফুট, এখানে তার বক্তব্য ফল্গুধারার আবেদন নিয়ে উপস্থাপিত হয়নি অনেক জায়গায়। তাই কান কেটে ফেলার দৃশ্যটির মধ্যে আকস্মিক অনিবার্যতা নেই। ক্রিস্টিনের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের পর বিদায়পর্বটিও আবেদনহীন। আবার বাস্তব ঘটনা হোল ভ্যান্ গখ্ তাঁর ডান কান কেটে কাফের মেয়ে রাশেলকে নিজে উপহার দিতে গিয়েছিলেন। সে ঘটনাকে অতদূর বিস্তৃত না কোরে ছবিতে বাঁ কান কাটা দেখানো হোয়েছে এবং তারপরেই এলো গখের মনোবিকার। আসল ঘটনার এ পরিবর্তনের সার্থকতা, ছায়াচিত্রে তার উপযোগিতা আমাদের বুদ্ধির অগম্য, কে-এর প্রতি ভ্যান গখের আকর্ষণ, প্রেম-নিবেদন, প্রত্যাখ্যান ও পরে বাপ-মায়ের সঙ্গে ঐ ব্যাপারে তর্কাতর্কির পর্যায়গুলি মনে রাখবার মতো। থিও ভ্যান্ গখের সঙ্গে শিল্পীর দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা গ্রন্থের কতকগুলি স্মরণীয় অংশ। ছবিতে একমাত্র বরিনেজের কয়লাখনি অঞ্চলে মিস্ত্রি ঘরে দুই ভাইয়ের সাক্ষাৎকার বেশ মর্মস্পর্শী; অন্যান্য সাক্ষাৎগুলি কেমন যেন প্রাণহীন। থিও-র ভূমিকায় জেমস্ ডোন্‌লড্-এর ব্যর্থতা এজন্য অনেকাংশে দায়ী।

বিখ্যাত শিল্পী পল গগ্যাঁর সঙ্গে ভ্যান্ গখের জীবনের একটা বিরাট অধ্যায় কেটেছিল। প্যারিসে শিল্পী-সান্নিধ্যের কাল থেকে গগ্যাঁর সাহচর্য ও পাশাপাশি একটা বিরোধিতা ভ্যান্ গখের জীবনের বহু উত্তেজনাময় মুহূর্তের কারণ। ছায়াছবিতে এসব দৃশ্যগুলির উত্তেজনা আছে, কিন্তু নেই অন্তর্নিহিত মর্মস্পর্শী আবেদন। খণ্ড খণ্ড ভাবে এ-দৃশ্য-গুলির পরিবেশনে অবশ্য পরিচালক ভিন্‌সেন্ত মিনেলি কিছুটা মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন, কিন্তু পারম্পর্য না থাকায় অভিনয়-দৌর্বল্যে বিশেষ কোরে পল গগ্যাঁর ভূমিকায় এ্যান্থনি কুইনের ব্যর্থতার পর্যায়গুলি মনে আশানুরূপ সাড়া জাগায় না। আর গগ্যাঁর চরিত্রে কুইন একটু বেমানানও বটে। ক্ষুর হাতে ভ্যান্ গখের ছুটে গিয়ে গলিমুখে গগ্যাঁর সামনে দাঁড়ানোর দৃশ্যটি সুপরিকল্পিত। কার্ক ডগলাসের অভিব্যক্তি ঐ দৃশ্যে অন্তত অনবদ্য। এ-দৃশ্যে ক্যামেরার কাজও যথেষ্ট সাহায্য কোরেছে। তবে আলোকচিত্রণ-পরিচালক ইয়ং-এর কৃতিত্বের স্বাক্ষর ছবিটির সর্বত্র। মিনেলির পরিচালনার আরেক নৈপুণ্যের দিক আর্লেওমেস্ত্ রেমিতে ভ্যান্ গখের প্রকৃতির মধ্যে ক্যানভাস, ইজেল ও প্যালেট নিয়ে অঙ্কনের মাধ্যমে জীবস-সাধনার দৃশ্যগুলি। নিসর্গ থেকে একেকটি চিত্রকে যেন শিল্পী ছিঁড়ে ক্যানভাসে জুড়ে দিয়েছেন। তারই চিত্তাকর্ষক প্রকাশ দেখেছি একেকটি সিকোয়েন্সের প্রকৃতির দৃশ্য দিয়ে শুরু হোয়ে শিল্পীর ছবি আঁকা ও পরে ধীরে ধীরে ভ্যান গখের মূল ছবির সমস্ত পর্দা জুড়ে উদ্ভাসিত

হোয়ে ওঠায়। নিসর্গ-শোভার মিছিল, ঝড়ের প্রচণ্ডতা, প্রান্তরের শান্তশ্রী যেন ক্যানভাসে ফুটে উঠেছে মেট্রো-কলারের নিপুণ ব্যবহারে। এ-পর্যায়গুলির সম্পাদন-কুশলতা অনস্বীকার্য।

এ-সব কিছু কিছু গুণ থাকলেও ছায়াছবিটিকে মোটামুটি ভাবে কেন প্রশংসা কোরতে পারলাম না, তার কারণ ফলশ্রুতি ও আবেদনের দিক থেকে মূল গ্রন্থের কাছাকাছি এগোতে পারেনি বর্তমান ছবিটি। দৃশ্যসুখ আছে বহু জায়গায় আগেই বোলেছি, কিন্তু শিল্পীর সাধনা, জীবন-পিপাসার যে মূল সুর সমগ্র গ্রন্থটিকে আকর্ষিক কোরেছে, তা ছায়াছবিতে বহুলাংশে অনুপস্থিত। ভ্যান গখের জীবনালেখ্যকে আশ্রয় কোরে মহৎ চিত্রসৃষ্টি সম্ভব একথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। এমন ঘটনাবহুল অথচ মননধর্মী শিল্পীজীবন থেকে যে মহৎ চলচ্চিত্র সৃষ্টি হলো না, কলাকৌশলের নানা আয়োজনের অভাব না থাকা সত্ত্বেও, এটাই চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকের মৌল ব্যর্থতা। 'এ্যান্ আমেরিকান ইন প্যারিস', 'ব্যাণ্ড্ ওয়াগন' প্রভৃতি চিত্রের পরিচালক মিনেলির শোম্যানশিপ-এর প্রমাণ এ ছবিতেও আছে। কিন্তু এমন একটি বিষয়ের উপযুক্ত শিল্পদৃষ্টি, সূক্ষ্ম রসবোধ ও কাহিনী সম্পর্কে বিচার-ক্ষমতার অভাবের জন্য বিরাট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও 'লাস্ট ফর লাইফ' চলচ্চিত্র হিসেবে সার্থক হোতে পারেনি। আরেকটি কথা, এখানে ভ্যান গখের মূল ছবির অসংখ্য নমুনা তুলে ধরা হোলেও, আমাদের বহু পরিচিত বিখ্যাত কিছু ছবি বাদ গেছে। ল্যাণ্ডস্কেপগুলির ওপরই যেন ছায়াছবি-নির্মাতারা বেশি নজর দিয়েছেন। মানুষকে নানাভাবে যে শিল্পী চিত্রিত কোরেছিলেন, সে-সব দিক একটু যেন অবজ্ঞাত রয়ে গেছে। "I want to paint humanity, humanity and again humanity."—ভ্যান গখের জীবনের এই বীজ-মন্ত্রের সন্ধান এ-ছবিতে আমরা তেমন পাইনি।

গৌতম বুদ্ধের জীবনীচিত্র। ভারত সরকারের ফিল্ম্স্ ডিভিসনের পরিবেশনায় বিমল রায় প্রোডাকসন্সের 'Gotama the Buddha' এক নব্য ধারার শিল্পকর্ম হিসেবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক উল্লেখ্য সংযোজন। এ-ধরণের পূর্ণ দৈর্ঘ্য ডকুমেণ্টারীও সম্ভবত ভারতে এই প্রথম। প্রস্তরমূর্তি, মন্দির ভাস্কর্য ও দেয়াল-চিত্রকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিন্যাস কোরে ধ্বনি, স্তোত্রপাঠ, সংগীত ও সর্বোপরি আবহ-বিবৃতি দিয়ে গ্রন্থনার সাহায্যে গৌতমবুদ্ধের জীবন ও বাণীকে মূর্ত করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। উপাদান ও উপায়নের দিক থেকে যেখানে এমন ভিন্ন আস্বাদনের সম্ভাবনা, সে-ছবি সেদিক থেকেই আকর্ষিক ও বিশেষভাবে আলোচ্য। এ রীতি-বৈচিত্র্যের মধ্যেই এর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য।

এশিয়ায় নানাস্থানে অবস্থিত বৌদ্ধমন্দির, স্তূপ ও বিক্ষিপ্ত প্রস্তরমূর্তি, ইউরোপের গুটিকয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ভাস্কর্যনিদর্শন ও অজন্তা ফ্রেস্কোর দৃশ্যাবলী থেকে এখানে চরিত্র ও ঘটনা চিত্রায়িত। কাহিনী বর্ণনা ও চরিত্রসৃষ্টির সুবিধার জন্য গোমতী, কৌণ্ডিল্য, যশোধরা ও আনন্দের জবানীতে বুদ্ধের জীবনালেখ্যকে বিভক্ত কোরে বিবৃতির পারম্পর্য দিয়ে এখানে মূর্তি ও চিত্রের একটা সংহত প্রাণসত্তা আনার প্রচেষ্টা।

বর্তমান চলচ্চিত্রটির সমগোত্রীয় একটি বিদেশী ছবি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিখ্যাত শিল্পী জিয়োত্তোর অঙ্কিত গির্জার ফ্রেস্কো থেকে যীশুখৃষ্টের জীবনের মূল ঘটনাগুলিকে নিয়ে লুসিয়ানো এমারের অনবদ্য চিত্রসৃষ্টি 'দি ড্রামা অব ক্রাইস্ট' দ্বারা এ-পদ্ধতিতে গৌতমবুদ্ধের জীবনচিত্র নির্মাণ নিঃসন্দেহে অনুপ্রাণিত। এমার সীমাবদ্ধ উপাদান নিয়ে যে আশ্চর্য ভাব-গভীর পরিবেশ রচনা কোরেছিলেন স্থিরচিত্রেও যে চরিত্রবৈশিষ্ট্য আরোপ কোরেছিলেন, বিস্তৃত বিষয়বস্তু ও আবহবিবৃতির সহায়তা নিয়েও প্রযোজক বিমল রায় ও চিত্রনাট্যকার-পরিচালক রাজবনস্ খান্না তার সমতুল্য চিত্রসৃষ্টি কোরতে পারেননি।

পরিকল্পনা মহৎ, উপকরণ বিপুল, কিন্তু পরিবেশন অপরিচ্ছন্ন, ফলশ্রুতি দুর্বল,—হয়তো স্বল্প কথায় এটাই গৌতমবুদ্ধ চিত্রটির সার্থক পরিচিতি। একই ঘটনার মধ্যে অনেকস্থানে দু'তিনটি অসমঞ্জস শিল্পরীতির মূর্তি ব্যবহারে সামগ্রিকভাবে ক্ষুণ্ণ হোয়েছে পর্যায়গুলির মুড ও টোন এর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা। দৃশ্য ও ধ্বনির সামঞ্জস্য কোরে সর্বত্র শট সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয়নি। কোন কোন পর্যায়ে ছাপা কপি থেকে নেওয়া অজন্তা ফ্রেস্কোর ছবি

দৃষ্টিকটু। মূর্তি বা চিত্রে শিল্পনির্দেশক সুধীন রায়ের 'ফিনিসিং' ক্লোজ-আপে বড় প্রকট। মনে হয় এ-পদ্ধতিতে সৌন্দর্য প্রমাণ এ-ছবির পক্ষে অপপ্রয়োগ। আলোকচিত্রী দিলীপ গুপ্ত শুধু কয়েকটি ক্লোজশটে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ; সাদাকালো টোনের সংঘাতে বা নানা দৃষ্টিকোণ নির্বাচনের সাহায্যে দৃশ্যগুলিকে অর্থবহ কোরে তুলতে পারেননি। অনেক জায়গায় 'অবজেক্ট'কে একইভাবে ঘুরিয়ে বা একই 'এ্যাঙ্গল থেকে দেখানোর ফলে একটা একঘেয়েমি এসেছে। ক্লে-মডলিং না করাই বাঞ্ছনীয় ছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্যায়গুলির ভাবাবেগকে সংহত করেনি। নৃত্যের ছন্দ আনার বা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনার প্রয়োগশৈলী পীড়াদায়ক। এই ধরনের দৃশ্যাবলী ফিল্ম্স্ ডিভিসনের 'খাজুরাহো' মন্দিরের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রটিতে অনেক বেশি ভাবময় ও রূপময়। নিপুণ সম্পাদনায় ও সংগীতে যুদ্ধের একটি পর্যায় অবশ্য সর্বাঙ্গসুন্দর। সামগ্রিকভাবে সংগীতাংশে সলিল চৌধুরী বেদনাদায়কভাবে ব্যর্থ। গানে যত্রতত্র হার্মনি, বিদেশি সুরের টান, অথবা লোকসংগীতের আমদানী—এ দিয়ে কি এমন সমুন্নত বিষয়বস্তুর আবেগের ব্যঞ্জনা সম্ভব ? সম্পাদনায় হৃষিকেশ মুখার্জী মোটামুটিভাবে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর দিয়েছেন। স্তোত্রপাঠে মানা দে সার্থক। কিন্তু আবহবিবৃতি নৈরাশ্যজনক। যে ছায়াছবির একটা প্রধান অঙ্গ সূত্রধার, একজন বাদ দিয়ে তাদের কারুরই বাচনভঙ্গী হৃদয়গ্রাহী নয়। অতিনাটকীয় স্বরক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রে কাহিনী অনুযায়ী হয়নি ; উচ্চারণ-অস্পষ্টতাও মাঝে মাঝে রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। বিবরণীর ভাষাও যেন এর চেয়ে আরো বেশি উৎকর্ষের অপেক্ষা রাখে।

গৌতমের জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত এই কাহিনী-অংশ জাগতিক নিয়ম ও মানুষের জীবন সম্পর্কের ও ধ্যান ধারণার একটা পূর্ব-প্রেক্ষাপটে বিধৃত ও বৌদ্ধধর্ম ও শান্তির বাণী প্রচারের পরিশিষ্টাংশে প্রলম্বিত। এই পরিশিষ্টাংশ প্রয়োগদৌর্বল্যে অংশত অপ্রয়োজনীয় ও ছায়াছবির সার্বিক বিচারে অসংলগ্ন। প্রচারের দিকটা প্রকট বোলেই হয়তো পর্যায়টি নেহাৎ অশৈল্পিক।

পাষাণমূর্তির আশ্চর্য শিল্পকলার এমন ব্যাপক পরিবেশন মাধ্যমে বুদ্ধজীবনীর একটি রূপসত্তা উদ্ভাসনের জন্য, ভারতীয় প্রামাণিক চিত্রের সীমাবিস্তারের জন্য এ-ছবির নির্মাতারা প্রশংসার্হ। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা রস-সংবেদিত শিল্পসৃষ্টি কোরতে পারেনি। সম্ভাবনা এ-ছবিতে অনেকটা যেন অসাফল্যের বেদনাময় ধূসরতায় অবসিত।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

মহিলা শিল্পীদের চিত্রপ্রদর্শনী। গত ১৫ই থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী '৫৭ গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম হলে ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে মহিলা শিল্পীদের তৃতীয় বার্ষিক নিখিল ভারত চিত্রপ্রদর্শনী হোয়েছিল। বর্ধমানের মহারানী-অধিরানী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। কোলকাতায় কেবলমাত্র মহিলা শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে প্রদর্শনী বড় একটা হয় না। সেদিক দিয়ে ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি শিল্পরসিকদের এবং বিশেষ কোরে মহিলা শিল্পীদের ধন্যবাদার্হ। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই যে প্রদর্শনীটি জনপ্রিয়তা অর্জন কোরেছে তা শিল্পীদের আগ্রহ থেকেই বোঝা যায়। জানা গিয়েছিল যে প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ২৫০ খানি ছবি এসেছিল; তার মধ্যে অবশ্য ১৫১ খানি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। শিল্পীদের মধ্যে বিভিন্ন মানসের মহিলা অংশ গ্রহণ কোরেছিলেন। মোটামুটিভাবে বিচার কোরলে শিল্প-সৃষ্টিগুলির মান খুব উঁচুদরের না হোলেও উৎসাহোদ্দীপক সন্দেহ নেই। সাধারণ দর্শকদের ভালো লাগার মতো বহু ছবি প্রদর্শনীতে ছিল। দুঃখের বিষয় বিচারকমণ্ডলীর বিচারে কোন বিভাগেই শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়নি। তৈলচিত্র বিভাগে বোম্বের শ্রীমতী কুমি, এইচ্, ডালাস দস্তরজী খুরসেদ ডাবুর প্রতিকৃতিটিতে, শ্রীমতী অসীমা চ্যাটার্জী প্রাকৃতিক চিত্রটিতে (প্রভাতের আলো) এবং

সুধা মুখার্জি অঙ্কিত 'নাচে নাচে পিব্‌লী নাচে'।

নীলা সুবারওয়াল অঙ্কিত 'ধূমপানের আসর'।

সুমিতা দে অঙ্কিত 'প্রেমিকের প্রতিকৃতি'।

সরমা ভৌমিক অঙ্কিত 'শবদাহের পরে'।

পরকাস কাউর নকুলা অঙ্কিত 'কাজের পর'।

বাসন্তী সেন অঙ্কিত 'ভোরের কাগজ'।

শিউলী বসু অঙ্কিত 'বিশ্রাম'।

সুনন্দা সেনগুপ্ত অঙ্কিত 'উদ্যানে'।

রমা মুখার্জী অঙ্কিত 'বুদ্ধের গৃহাগমন'।

রেণুকা ভগৎ অঙ্কিত 'খাবার সময়'।

শ্রীমতী বাসন্তী সেন স্টিল লাইফ স্টাডি (মর্নিং পেপার) চিত্রটির জন্য পুরস্কার লাভ কোরেছেন। জলরঙের বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছেন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী ব্যানার্জী 'সদ্যোজাত' চিত্রটির জন্য। ভারতীয় শিল্পধারায় অঙ্কিত চিত্রবিভাগে 'বৈতানিক' চিত্রটির জন্য শ্রীমতী মায়া রায় এবং 'আমাদের শান্তিনিকেতন' ছবিটির জন্য শ্রীমতী নমিতা ঘোষাল পুরস্কার লাভ কোরেছেন। আধুনিক রীতিতে আঁকা ছবির বিভাগে শ্রীমতী সুধা মুখার্জি 'নাচে নাচে পিব্‌লি নাচে' এবং গ্রাফিক আর্ট বিভাগে শ্রীমতী সুমিতা দে 'প্রেমিকের প্রতিকৃতি' চিত্রের জন্য পুরস্কার লাভ কোরেছেন। যাঁরা পুরস্কার পাননি, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন।

শ্রীমতী মায়া রায়ের 'বৈতানিক' ছবিটি ভারতীয় ধারায় আঁকা একটি সুন্দর ছবি। চারজন মহিলা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গীতে বসে একসঙ্গে একটি সুর সৃষ্টিতে মত্ত, তা ছবিটিতে ফুটে উঠেছে। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী ব্যানার্জীর 'সদ্যোজাত' ছবিটিতে তুলির টানে শিল্পীর মুন্সীয়ানার পরিচয় আছে। শ্রীমতী শিউলী বসুর 'বিশ্রাম' চিত্রটিতে তিনটি হাঁসের অবসন্ন ভাব দেখা যায়। দিল্লীর শ্রীমতী পরকাস কাউর নরুলার 'কাজের পর' ছবিটিতে চারটি শ্রমিকের কর্মান্তে বিশ্রম্ভালাপের চিত্র স্বাভাবিক দৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভালোভাবেই চিত্রিত হোয়েছে। শ্রীঅসীমা চ্যাটার্জীর আঁকা 'প্রভাতী আলো' ছবিটিতে সাদাসিধে একটি বাড়ির গায়ে সকালের রোদ এসে পড়ার দৃশ্য বেশ স্বাভাবিক ও সুন্দর হোয়েছে। শ্রীমতী গায়ত্রী দত্তর 'শ্রীচৈতন্য' ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা একটি সুন্দর ছবি। হায়দ্রাবাদের শিল্পী কমল মিট্টল-এর আঁকা 'নর্তকীরা' ছবিটিতে একটি বলিষ্ঠ ছন্দ আছে। শ্রীমতী কুমি, এইচ, ডালাস-এর তেলরঙে পাশ্চাত্য রীতিতে আঁকা দস্তরজীর প্রতিকৃতিটি প্রশংসনীয়। শ্রীমতী নীলিমা দে-র আঁকা 'আলেখ্য দর্শন' ছবিটি রেখার সারল্যে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী শীলা সুবারওয়াল-এর 'ধূমপানের আসর' ছবিটিতে পাশ্চাত্য শিল্পরীতির প্রভাব থাকলেও শিল্পীর দক্ষতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা আর দুটি সুন্দর ছবি হলো শ্রীমতী প্রমীলা শেঠীর 'মীরা' এবং শ্রীমতী রমা মুখার্জীর 'বুদ্ধের গৃহাগমন'।

এই প্রসঙ্গে একটি চিন্তার বিষয় এই যে ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলির মধ্যে বিশেষ নূতনত্ব পাওয়া যায়নি। ঐ রীতি বজায় রেখে নূতনতর শিল্প সৃষ্টি কোরতে পারলে তবেই সে শিল্পী সার্থক হবে; কেবল ঐ ধারাকে অনুসরণ কোরে ছবি আঁকলেই চলবে না; সেই প্রবাহিত ধারায় নতুন প্রাণ সঞ্চার কোরতে হবে। মৌলিক প্রতিভার অধিকারিণী সেই মহিলা শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টি দেখার জন্য সকলে সাগ্রহে অপেক্ষা কোরবে।

মহিলা শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজন পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পধারা অনুসরণ কোরে ছবি আঁকছেন; তাঁদেরও ওই একই কথাই বলা যায় যে অন্ধ অনুকরণ না কোরে তাঁরা নিজের প্রাণের শিল্প-প্রেরণা মিশিয়ে নূতনতর সৃষ্টির দ্বারা নিজেদের শিল্পীজীবন সার্থকতার পথে নিয়ে চলুন।

সত্য, শিব হোতে পারে—
তবে কদাচ সুন্দর নয়।

মিথ্যাই সুন্দর!

পত্রহীণ পুষ্পহীণ শীতের শুক্‌নো ডালের মত
সত্যের রূপ।

বসন্তের ফুল ফোটার মহোৎসবের নাম মিথ্যা।

রূপহীণ সত্য।
অপরূপ মিথ্যা।

হে মিথ্যা!
শিল্পীর চিরন্তন উপাস্য তুমি।
তোমার আরাধনায়
সহস্রদল পদ্মের ন্যায় সৌন্দর্য্যের বীজমন্ত্রের
চিরন্তন বিকাশ ও উপলব্ধি।

কমলা চৌধুরী

রঘুনাথ গোস্বামী

বিবসনা বা ন্যুড।

আ ফটারনুন রেষ্ট।

সারা বছর ধরে কলকাতার পার্ক স্ট্রীটে আর্টিস্ট্রি হাউসে প্রদর্শনী প্রায় লেগেই থাকে। এইসব প্রদর্শনীর মধ্যে পুরাতন প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী থেকে শুরু করে আধা-প্রসিদ্ধ এবং একেবারে আনকোরা নূতন শিল্পীদের ছবির পশরা সাজিয়ে প্রায়ই বসে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কজন-ই বা দাগ কাটতে পারেন রসিক দর্শকদের মনে। প্রদর্শনীর এই মিছিলের মাঝে কখন কখনও এক আধজন শিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁদের পেয়ে মনে একটা আবিষ্কার করার আনন্দ লাভ করা যায়।

গত মাসে আর্টিস্ট্রি হাউসে শ্রীযুক্তা কমলা চৌধুরীর ছবির প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে এমনিধারা একজন ক্ষমতা-শালিনী মহিলা শিল্পীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। আর্টিস্ট্রি হাউসে অনুষ্ঠিত হৈমন্তী সেনের ছবির প্রদর্শনীর পর কমলা চৌধুরীর মত ক্ষমতাশালিনী মহিলা শিল্পীর সাক্ষাৎ আমরা পাইনি।

১৯৪৮ সালে শ্রীযুক্তা চৌধুরী কলকাতা সরকারী কলা বিদ্যালয় থেকে পাশ করে প্যারিসে যান ছবি আঁকা শিখতে। প্যারিস থেকে ফেরবার পর এই তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। সর্বসমেত ২৩খানি পেইন্টিং এবং ৪৩খানি ড্রইং নিয়ে তাঁর প্রদর্শনী।

শ্রীযুক্তা চৌধুরীর কাজের মধ্যে সমসাময়িক ইউরোপীয় চিত্রধারার প্রভাব রয়েছে একথা স্বীকার কোরলেও তাঁর ছবি দেখে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে শ্রীযুক্তা চৌধুরী চিত্রের বিষয়বস্তুকে নিজের চোখে দেখেছেন, অনুভব কোরেছেন, তারপর তাকে অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ কোরেছেন।

এই তিনটি গুণের একক সমাবেশ কোন শিল্পীর পক্ষে মামুলি কথা নয়। বহু শিল্পী আধুনিকতার প্রলোভনে পড়ে সব কিছুতেই স্বকীয়তাকে ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পশ্চিমের সমসাময়িক শিল্পী বিশেষের বা শিল্পধারার অন্ধ অনুকরণ কোরে চলেছেন।

স্বকীয় উপলব্ধি এবং স্বকীয় প্রকাশভঙ্গীকে বাদ দিয়ে কোন মহৎ শিল্পসৃষ্টি হোতে পারে না। শ্রীযুক্তা চৌধুরী নিঃসন্দেহে এই পূর্ববর্ণিত নকলনবীশদের দলে পড়েন না। তাঁর চিন্তাধারা এবং প্রকাশভঙ্গীর উপর এক বা একাধিক 'স্কুলের' সুস্থ প্রভাব থাকলেও তাঁর সচেতন শিল্পীমানসকে নষ্ট বা ভ্রষ্ট কোরতে পারেনি।

বহু দুর্ধর্ষ সমালোচক তাঁর ছবির শরব্যবচ্ছেদ কোরে কোন্ কোন্ ছবির কোন্ কোন্ অঙ্গে কোন্ কোন্ শিল্পীর অবিকল ছাপ রয়েছে তার একটি সঠিক তালিকা হয়তো তৈরী কোরতে পারবেন কিন্তু তা দ্বারা তাঁর শক্তিকে খর্ব করা যাবে না বোলেই আমার বিশ্বাস।

ছবির ষ্ট্রাকচারের ব্যাপারে শ্রীযুক্তা চৌধুরী যে আশ্চর্য দৃঢ়তা এবং শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা দেখে বিস্মিত হোতে হয়। আমাদের দেশে বিশেষ কোরে বাংলাদেশের বেশির ভাগ মহিলা শিল্পীদের কাজের মধ্যে অনিবার্যভাবে একটি মেয়েলি ছাপ থেকে যায়।

বাংলাদেশের মহিলা শিল্পীদের চিন্তাধারা থেকে শুরু করে দৃষ্টিকোণ, প্রকাশভঙ্গী এবং অঙ্কন পদ্ধতি সব কিছুতেই এই মেয়েলি ছাপটা খুবই প্রকট। এটা ভালো কি খারাপ সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও এবং এটাকে স্বাভাবিক বোলে মেনে নিয়েও একথা বোধ হয় বলা যায় যে এটা এমনই এক ধরনের সচেতনতা যা শিল্পীসত্তাকে আচ্ছন্ন কোরে ফেলে। শ্রীযুক্তা চৌধুরীর কাজের মধ্যে বিন্দুমাত্র মেয়েলি ছাপও অনুপস্থিত। তাঁর ছবির গঠন, রং, এবং রেখার বলিষ্ঠতা ও বৈচিত্র্য দেখে দর্শক এটা স্পষ্ট উপলব্ধি কোরতে পারেন যে প্রকৃতি-নির্দিষ্ট পার্থক্যের উঁচুতে উঠে শ্রীযুক্তা চৌধুরী সত্যকার শিল্পী হওয়ার সাধনা কোরছেন। তাই তাঁর রং-এ এত উত্তাপ, রেখায় এত দৃঢ়তা। আর-একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তাঁর ছবির এক্সপ্রেশন। ছবির পাত্র-পাত্রীর চোখে-মুখে এবং দেহ-ভঙ্গীমায় এক্সপ্রেশন অত্যন্ত জোরালো অথচ তা কত সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পপ্রয়াসে অনায়াসলব্ধ। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে 'বাই দি উইণ্ডো', 'ইয়োলো ফ্লাওয়ার', 'গার্ল ইন রেড', 'আফটারনুন রেষ্ট' আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। তাঁর 'হ্যাড'-এর মতো উঁচুদরের হ্যাড স্টাডি বহুকাল চোখে পড়েনি।

শ্রীযুক্তা চৌধুরীর ৪৩খানি ড্রইং-এর মধ্যে 'হ্যাড'গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ কোরতে চাই। এই ড্রইংগুলির প্রচণ্ড সবলতা এবং আবেগ আমাদের বিস্মিত কোরেছে।

শ্রীযুক্তা চৌধুরীর কাজের মধ্যে আমরা যে সম্ভাবনার পরিচয় পেলাম তাতে আমরা ভবিষ্যতে তাঁর আরও কাজ দেখবার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা কোরে রইলাম।

। ষ্টিল লাইফ।

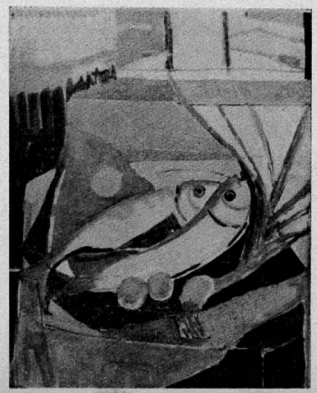

প্রচারশিল্পী অর্চনা সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি কর্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত

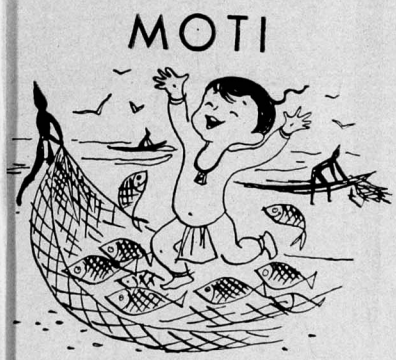

। স্টেট্‌স্‌ম্যানের শিশুবিভাগে প্রকাশিত একটি হেড্‌পীস

। স্টেট্‌স্‌ম্যানের শিশুবিভাগে প্রকাশিত আরেকটি হেড্‌পিস।

। স্টেট্‌স্‌ম্যানের মহিলাবিভাগে প্রকাশিত একটি হেড্‌পীস।

শিল্পের সৌন্দর্যে আজ বিজ্ঞাপন পরিবেশিত হয় অসংখ্য ক্রেতার সমক্ষে। শিল্পধৃত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আজ জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ানো হয়, প্রচার করা হয় নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারের। বিজ্ঞাপন আজ শিল্পকর্ম, বিজ্ঞাপনচিত্র আজ নন্দনমূল্যে উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট।

ভারতবর্ষের বিজ্ঞাপনশিল্পকে এই নন্দনমূল্যে মূল্যবান কোরে তোলায় পুরুষ-শিল্পীরাই পুরো কৃতিত্ব দাবী কোরতে পারেন। মহিলা-শিল্পীদের দান এ-ক্ষেত্রে নগণ্যতম, প্রায় নেই বোললেই চলে।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে ক্রমশ দু-একজন মহিলা-শিল্পী এদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। দু-একজন মহিলা-শিল্পী বিজ্ঞাপন-শিল্পে ইতোমধ্যেই তাঁদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমতী অর্চনা সেন সেই বিরলসংখ্যক মহিলা প্রচার-শিল্পীদের অন্যতমা।

জেমস গ্রেনভী এণ্ড কোম্পানী এবং ক্যালকাটা ফোটোটাইপ কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সেনের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী অর্চনা সেন ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে অর্চনার ঝোঁক ছিল। তাঁর এই সহজাত শিল্পপ্রবণতা মার সংস্পর্শে পুষ্টিলাভ কোরতে পেরেছিল। কারণ তাঁর মা শ্রীমতী অমিয়া সেন দ্বিতীয় দশকের একজন নামী শিল্পী ছিলেন। ১৯২৫ সালে লেডি লিটন আয়োজিত প্রথম কমার্শিয়াল আর্ট এক্জিবিশনে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের জন্য শ্রীমতী সেনের আঁকা একটি পোষ্টার ডিজাইন প্রথম পুরস্কার হিসাবে লেডী রিডিংস কাপ অর্জন করে। এবং এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অর্চনার মতো তাঁর মা-ও নিয়মিতভাবে কার-ও কাছ থেকে কোনদিন কোন শিল্পশিক্ষা করেননি। এলাহাবাদের মিশনারী মিস রডরিকের কাছে তিনি সামান্য কিছুদিন যে শিল্পশিক্ষা কোরেছিলেন, শিক্ষা হিসাবে তা উল্লেখ্য কিছু নয়।

অর্চনার শিল্পীজীবনের প্রাথমিক প্রেরণার উৎস তাঁর মা-র এই স্বভাব-শিল্পনৈপুণ্য। এবং মা-র মতো অর্চনাও কারও কাছে বিশেষভাবে কোন শিল্প শিক্ষা না কোরে তেমনি এক স্বভাব-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ছোটবেলায় অর্চনা স্বর্গত প্রচারশিল্পী যতীশ দাশগুপ্তের কাছে কিছুদিনের জন্য শিল্পশিক্ষা কোরেছিলেন। এবং আজ পর্যন্ত আর কারও কাছে তিনি কোন শিক্ষা গ্রহণ করেননি।

স্কুল-কলেজের চার দেয়ালের বাইরেও যে প্রতিভার জন্ম সম্ভব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিভা যে এই চার দেয়ালের বাইরে-ই জন্মায়, তার প্রচুর নজির দেশ-বিদেশের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাসে বিদ্যমান। এই কারণেই বোধ করি অশিক্ষিতপটুত্ব কথাটার উৎপত্তি হোয়েছে। বিশেষ কারও কাছে বা কোন শিল্প-বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষা না কোরেও শ্রীমতী অর্চনা সেন যে শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই প্রশংসার্হ।

অর্চনা সেন অঙ্কিত একটি কার্ডএর নমুনা।

লরেটো হাউস থেকে আই, এস-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোয়ে সিটি কলেজে উদ্ভিদ-বিদ্যায় অনার্স নিয়ে বি. এস-সি শ্রেণীতে ভর্তি হোলেন। ১৯৫১ সালে বি, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোয়ে এম, এস-সি শ্রেণীতে ভর্তি হোলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। পড়াশুনা ধীরগতিতে এগিয়ে চলেছে, এমন সময় এ্যাড্ভারটাইজিং করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া থেকে আহ্বান এলো। পড়াশুনায় ছেদ টেনে অর্চনা সেখানে প্রচারশিল্পী হিসাবে যোগদান কোরলেন। একবছর সেখানে কাজ করার পর তিনি ষ্টোনাক অ্যাড্ভারটাইজিং-এ যোগদান করেন এবং বিলুপ্তিকাল পর্যন্ত তিনি ষ্টোনাক-এ কাজ কোরেছিলেন।

কে-এল্-এম্ ডাচ্ এয়ারলাইনস-এর

একটি গ্রীটিংস-কার্ড।

প্রতিযোগিতায় এই গ্রীটিংস-কার্ডটি প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত।

উপরোক্ত অ্যাড্ভারটাইজিং করপোরেশনে শিল্পী হিসাবে তাঁর যোগদান আকস্মিক শুধু নয়, মজার-ও বটে। উক্ত অফিসের কর্মকর্তা একদিন অর্চনার পিতাকে অফিসের জন্য একজন কমার্শিয়াল আর্টিষ্টের দরকারের কথা বোললেন। অর্চনার ছবির খাতাটা সৌভাগ্য-ক্রমে তাঁদের কাছের একটি টেবিলে পড়ে ছিল। ঐ

। ষ্টেট্স্ম্যানে প্রকাশিত একটি হেড্পীস।

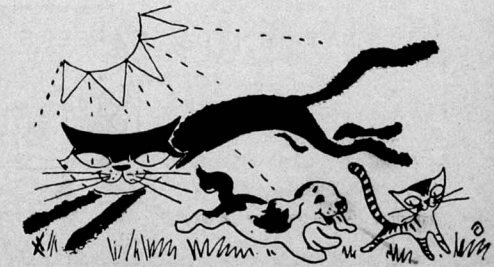

খাতাটা ঘটনাক্রমে উক্ত কর্মকর্তার হাতে পড়ে। ছবিগুলি দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং নরেন বাবুকে বলেন: আমি এই জাতীয় শিল্পী-ই চাই। আপনি কি এই ছবির শিল্পীকে দয়া কোরে আমার আপিসে পাঠিয়ে দেবেন? নরেনবাবু শিল্পীর পরিচয় ভাঙলেন না। এমন কি শিল্পীটি যে মহিলা সে-কথাও উহ্য রাখলেন। পরের দিন অর্চনা সেই কর্মকর্তার কাছে যেতে তো তিনি অবাক! অর্চনা তাঁর পরিচয় দিলেন। খুশি হোয়ে তিনি অর্চনাকে কাজে বহাল কোরলেন। এতদিন যাঁর শিল্প-সাধনা নীরবতায় আবৃত ছিল, এবার তা প্রকাশ পাবার সুযোগ পেল। নীরব শিল্পী অর্চনা সেন হোলেন প্রচারশিল্পী, বাংলা চিত্রশিল্পের জগতে একটি বিরল ঘটনা।

অ্যাড্‌ভারটাইজিং কর্পোরেশন থেকে ষ্টোনাক-এ এলেন অর্চনা। এ-সময় তাঁর আবার পড়াশুনা করবার ইচ্ছা হলো। এবার কিন্তু আর বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য। এম, এস-সি নয়, এম, এ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স গ্রাজুয়েটকে এম, এ পড়তে অনুমতি দিলো না। বোল্‌লে, বি, এ পাশ কোরতে হবে। পিছ-পা হবার মেয়ে নন অর্চনা। পড়াশুনায় আত্মনিয়োগ কোরলেন। এবং প্রাইভেটে বি, এ পাশ কোরে তাঁর মনের জোর ও উৎসাহের প্রমাণ দিলেন।

ষ্টোনাক অ্যাড্‌ভারটাইজিং উঠে যাবার পর অর্চনা সেন কিছুদিন বসে রইলেন। কিন্তু কিছু না কোরে বসে থাকার মেয়ে নন তিনি। তাড়া ছাড়া ক্ষমতাপন্ন কর্মিষ্ঠ হাত কোন কোন গুণগ্রাহীর নজরে ঠিক পড়বেই। ষ্টেট্‌সম্যানের হ্যারিস সাহেব অর্চনাকে শিল্পী-সম্মান দিয়ে তাঁর গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিলেন। বর্তমানে শ্রীমতী অর্চনা সেন ষ্টেট্‌সম্যানের শিল্পবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

ও-পাতা এবং এ-পাতার ছবিগুলি

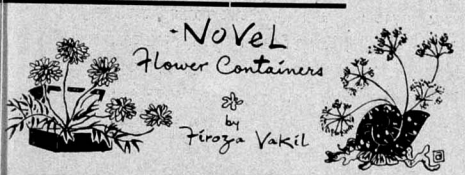

অর্চনা সেন অঙ্কিত হেড্‌পীস

শ্রীমতী অর্চনা সেন কমার্শিয়াল আর্টের কাজ প্রচুর না কোরলেও যা কোরেছেন, তাতেই তার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁর কাছ প্রধানত ইলাষ্ট্রেটিভ। তাঁর ইলাষ্ট্রেশন-গুলি সুন্দর। রেখা ও রঙের যথাযথ ব্যবহারে বিশিষ্ট।

কিন্তু সবচাইতে প্রশংসনীয় হলো তাঁর ফিগারগুলি। বস্তুত এত প্রত্যক্ষ ও কমনীয় রেখায় তিনি ফিগার আঁকেন যে উচ্ছ্বসিত না হোয়ে উপায় নেই। ফিগারের কাজে তাঁর মুন্সীয়ানা সত্যই মুগ্ধ করে।

কমার্শিয়েল আর্টের কাজ ছাড়া শ্রীমতী সেন অল্পসংখ্যক পোর্ট্রেটও এঁকেছেন।

ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকছেন শ্রীমতী অর্চনা সেন। তাঁর প্রথম ছবি যখন প্রশংসার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাঁর বয়স বড় জোর চৌদ্দ। ঐ সময় তিনি কোলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ধর্মেন্দ্রর জন্য অনেকগুলি হেলথ পোষ্টার এঁকেছিলেন। শ্রীমতী সেন তারুণ্যেই গুণীজন-স্বীকৃতি পাবার সৌভাগ্যও অর্জন কোরেছেন। বামার লরী নামে বিখ্যাত শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত প্রেস অ্যাড্‌ভারটাইজিং কন্‌টেষ্টে তিনি প্রথম স্থান অধিকার কোরে পুরস্কৃত হোয়েছিলেন। এ দিক দিয়ে অর্চনা তাঁর মায়ের সুযোগ্য কন্যা।

অর্চনার দিদি শ্রীমতী অরুণা দত্ত-ও একজন গুণী শিল্পী। পোষ্টারের কাজে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের জন্য তিনি অনেকগুলি ট্র্যাভেল পোষ্টার এঁকেছিলেন। অর্চনার চার ভাইয়ের মধ্যে চারজনই শিল্পরসিক ও শিল্পোৎসাহী। বিজ্ঞান শিক্ষা কোরলেও শিল্পকলার প্রতি তাঁদের প্রবণতা অসীম। এঁদের অন্যতম বামার লরীর বিজ্ঞাপন-সচিব শ্রীযুক্ত প্রীতি

সেনের শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের পাঠকরা হয়তো পেয়ে থাকবেন। ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপরে মাঝে মাঝে বামার লরীর যে সুরুচি-শোভন প্রীতিকর বিজ্ঞাপনগুলি ইতপূর্বে প্রকাশিত হোয়েছে, তা প্রীতিবাবুর শিল্পজ্ঞানেরই ফলশ্রুতি। অথচ এটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে অর্চনা কিংবা তাঁর ভাই-বোনেরা কেউ-ই কোনদিন নিয়মিত শিল্পশিক্ষা করেননি। শিল্পবোধ যে সব সময় স্কুল-কলেজে বা শিক্ষকের কাছ থেকে আরম্ভ করতেই হবে এমন কথা ঠিক নয়। নরেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যারাই এর বিরুদ্ধে সাক্ষি স্বরূপ।

শ্রীমতী অর্চনা সেন ছবি আঁকাকে নিছক পেশা হিসাবে কোনদিন মনে করেননি। ছবি এঁকেছেন নেশা হিসাবে, মনের আনন্দে বাঁধা খাতার পাতার পর পাতা ভরিয়ে তুলেছেন তুলি আর রঙের সহযোগিতায়। আনন্দ, শুধু আনন্দেই ছবি এঁকেছেন। বিনিময়ে তার কিছু পাবার আশা করেননি কখনো। একেই বলে শিল্পীমন!

শুধু ছবি নয়, শিল্পের অন্যান্য মার্গেও অর্চনার স্বচ্ছন্দ পদচারণা প্রশংসনীয়ভাবে লক্ষণীয়। খুব ভালো পিয়ানো এবং সেতার বাজাতে পারেন তিনি। রমণীয় কণ্ঠস্বরেরও অধিকারিণী। ভারতীয় সংগীতে অদ্ভুত তাঁর দখল। ভারতীয় নৃত্যেও তাঁর উৎসাহ অনেকখানি।

গান-বাজনা, লেখাপড়া, ছবি-আঁকা, শিল্প-সাহিত্যের সব ব্যাপারেই এমন বহুধা উৎসাহ একজনের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। সর্বাত্মক চিৎপ্রকর্ষ-বিশিষ্টা শ্রীমতী অর্চনা সেনের ব্যক্তিত্ব সত্যই আকর্ষণীয়।

আত্মপ্রচারে পরাঙ্মুখ শ্রীমতী সেন। স্বীয় ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ও সুস্থ-সুন্দর জীবন-গঠনই তাঁর মূল লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যের পথে আত্মপ্রচারকে প্রধান অন্তরায় স্বরূপ মনে করেন বোলে তিনি এখনো এদেশের সাধারণ্যে অপেক্ষাকৃত অপরিচিতা।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যান থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে সম্প্রতি তিনি ইওরোপের পথে পাড়ি দিয়েছেন। রোম, প্যারিস, আমস্টার্ডাম ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করার বাসনা আছে তাঁর। তবে এই এক বছর লণ্ডন-ই হবে তাঁর প্রধান কর্মস্থল। পশ্চিম থেকে নতুন চিন্তা, নতুন ভাব-ধারায় সমৃদ্ধ-মনন হোয়ে স্বদেশে ফিরে প্রচারশিল্পজগতে নব নব উন্মেষশালী ক্ষমতার বহুব্যাপক পরিচয় দেবেন বোলে আমাদের বিশ্বাস।

অর্চনা সেনের চরিত্রে নারীসুলভ নম্রতা, লাবণ্য ও স্নিগ্ধতার সঙ্গে মিশেছে পুরুষের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্ম-ক্ষমতা। তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা ও রসবোধ তাঁর চরিত্রমাধুর্যে এনেছে প্রীতিপ্রদ অভিনবত্ব। দৃঢ়চরিত্র, নম্রস্বভাবা, আত্ম-প্রত্যয়সম্পন্না ও কর্মপ্রিয় নিরলস অর্চনা সেন শুধু একজন প্রতিশ্রুতিসম্পন্না প্রচারশিল্পী-ই নন, একজন সাংবাদিকও বটে। তবে সবার উপর সার্থক-সুন্দর জীবনশিল্পীই তিনি!

অঙ্কন ইপ্সা মানুষের আদিমতম বৃত্তির অন্যতম। মানুষ এমন কি নিজের শরীরেও নানা বেদনা উদ্রেককারী প্রথায় চিত্র-বিচিত্র কোরে আসছে আদিম যুগ থেকে।

শীলা দেবীর অঙ্কিত একটী চিত্রের প্রতিলিপি।

শিল্পী শীলা অডেন

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের মাটিকে অনেকদিন ছেড়ে গেলেও সেই মাটির মায়া যাঁর অধিকাংশ শিল্পকর্মে রঙে-রেখায় নানাভাবে ফুটে উঠেছে লব্ধকীর্তি সেই কৃতী শিল্পী বাংলার সাধারণ্যে এখনো অপেক্ষাকৃত অপরিচিতা হোলেও, শিল্পচর্চার সততা ও আন্তরিকতায় তিনি আধুনিক শিল্পীদের অন্তরলোকের শ্রদ্ধা পেয়ে থাকেন সর্বদা।

সাতসমুদ্র তের নদীর পারে সুদূর ইংলণ্ডে, ভারতীয় নয়, ইংরেজের গৃহিণীরূপে এখনো যিনি ভারতীয় চিত্তের অমিশ্র নির্যাসে শিল্পচর্চা করেন, সমাদরযোগ্যা এদেশের সেই বাঙালী শিল্পীর নাম—শীলা অডেন।

শীলা অডেন, বিবাহপূর্ব যুগের শীলা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট স্বনামধন্য উমেশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী। শীলার পিতা আর, সি, বোনার্জী একজন বিখ্যাত ব্যবহারজিবী ছিলেন। শিল্পবোধ ও সাহিত্যে তাঁর প্রশংসার্হ অধিকার হয়তো শীলার মনে শিল্প-প্রেরণা যোগাতে যথেষ্ট সাহায্য কোরেছিল। শীলার শিল্পচেতনার সার্থক-সুন্দর উন্মোচন ক্রিয়ায় তাইত তাঁর পিতার স্বাভাবিক দান অনুল্লেখ্য নয়।

ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে শীলার ঝোঁক ছিল। প্রথম অবস্থায় বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রকর দেবী-প্রসাদ রায়চৌধুরীর সংস্পর্শে তাঁর শিল্পচর্চা পরিশীলিত হবার সুযোগ লাভ করে। দেবীপ্রসাদের কাছে কিছুকাল শিক্ষা নেবার পর তিনি স্বাধীনভাবে ছবি আঁকা সুরু করেন। এরপর কিছুদিনের জন্য তিনি শিক্ষার্থে য়ুরোপ যাত্রা করেন। দেশে ফিরে এসে আবার ব্যাপকভাবে ছবি আঁকতে থাকেন। কিন্তু এসময় তিনি তাঁর কাজে কিসের যেন একটা অভাব অনুভব করেন। সৌভাগ্যবশত এই সময় তিনি ভারতীয় চিত্রশিল্পের অনন্য পুরুষ যামিনী রায়ের ফলপ্রসূ সাহচর্য লাভে কৃতকার্য হন। এই সাহচর্যের ফলে তাঁর মনোরাজ্যে একটা পরিবর্তন আসে। তিনি নতুন পথের ইঙ্গিত পেলেন। যামিনী রায়ের কাছ থেকে চিত্রকে নতুন রূপে প্রকাশ করার পাথেয় সঞ্চয় কোরলেন। শীলা দেবীর ছবি বৈশিষ্ট্যে সুন্দর হলো।

বাংলার লুপ্তপ্রায় লোকশিল্পের পথে শীলা দেবীর পদচারণা। কিন্তু তাঁর সেই পদচারণায় শ্রদ্ধাভাজন পূর্বসূরী যামিনী রায়ের যান্ত্রিক অনুসরণ নেই, অথচ তা প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যে লক্ষণীয়রকমের উল্লেখ্য। ভারতীয় পটচিত্রে সাধারণত টেম্পারা রং ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শীলা দেবীর লোকশিল্পাশ্রিত চিত্রাবলী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেল-রঙে আঁকা। মাধ্যম হিসাবে তেল-রং নির্বাচনের এই সাহস কৃতী শিল্পীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য। রঙের বাচনভঙ্গীর এই অভিনবত্ব শীলা দেবীর ছবিকে এক আকর্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য দান কোরেছে, তাঁর ছবিকে স্মরণীয়তার পর্যায়ে তুলে এনেছে।

ছবি আঁকা ছাড়াও শীলা দেবী অন্যতম শিল্প-সমালোচক হিসাবে কিছুদিন কোলকাতার ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শিল্পের ক্ষেত্রে আধুনিকতার ধারক হওয়াতে তিনি আধুনিক শিল্পীদের ধ্যান-ধারণা, শিল্পৈষণা বা দুঃখ-বেদনা সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রপ্রিয়-সাধারণের কাছে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। আধুনিক শিল্পীর সহৃদয় বন্ধু হিসাবে তিনি তাঁদের সৃষ্টির মূল্যায়নে যে যাথার্থ্যবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর সমালোচক-মানসের পরিচয়ও বিশেষভাবে প্রমূর্ত।

বাংলাদেশে মহিলাশিল্পী সংখ্যায় খুব অপরিমিত নন। সেই স্বল্পসংখ্যক মহিলা শিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্যদের অন্যতমা শীলা দেবী। লোকশিল্প ও আধুনিক শিল্পধারার সেতুবন্ধে যাঁরা সাহায্য কোরেছেন, তাঁদের মধ্যে শীলা দেবী বাঙালী শিল্পীর নিজস্বতার সুনিশ্চিত স্বাক্ষর রেখেছেন।

শীলা দেবী স্বনামধন্য আধুনিক ইংরেজ কবি অডেন-এর ভ্রাতাকে বিবাহ কোরেছেন। বর্তমানে তিনি লণ্ডনে পাকাপাকিভাবেই বসবাস করছেন।

কিন্তু বিদেশে থেকেও যিনি দেশকে ভোলেননি, শ্রদ্ধেয় সেই শিল্পী শীলা অডেনের উপযুক্ত পরিচয় এবংবিধ সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। সুন্দরম্-এর পক্ষ থেকে এ-সম্পর্কে ভবিষ্যতে বিশদভাবে আলোচনা করার বাসনা রইলো।

। লোকশিল্পের সহজ ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে আধুনিক শিল্পের শুভদৃষ্টি আনবাং।

হৈমন্তী সেন

বিশেষ প্রতিনিধি

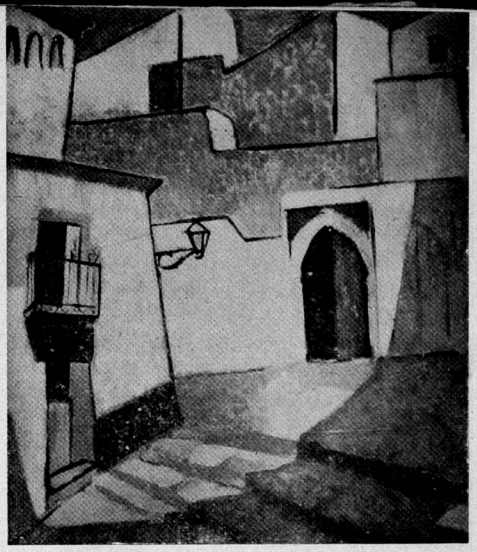

পথের কোনা—পেন।

সাম্প্রতিককালে যে সকল মহিলা-শিল্পী তারুণ্যেই প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন হৈমন্তী সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩০ সালে তিনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত কোরে উচ্চ শিক্ষা লাভেচ্ছায় তিনি কোলকাতার আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৪৯ সালে বি-এ পাশ করেন। বহু দিন থেকেই শ্রীমতী সেন চারুকলার প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর সেই অনুরক্তি সার্থক রূপায়ণে পরিণতি লাভ করে। স্নাতকত্ব লাভ কোরবার পর সেই বছরেই শিল্প শিক্ষাকল্পে তিনি সরকারী চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। প্রবেশকালে অঙ্কন-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করায় কলেজ কর্তৃপক্ষ একেবারেই তাঁকে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি করেন। কৃতী ছাত্রী হিসেবে এই সময়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন যথেষ্ট।

১৯৫২ সালে তিনি সরকারী চারু ও কারুমহাবিদ্যালয় থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বছরেই আরম্ভ হয় পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে তাঁর ক্লান্তিহীন অভিযান। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন নতুন থেকে নতুনের দিকে। উজ্জ্বল জীবনের পথে সার্থক শিল্পী হৈমন্তী সেনের যাত্রা হলো সুরু।

সর্বপ্রথম তিনি যান লণ্ডনে, তারপর ইটালীতে। ইটালীতে ফ্লোরেন্সের প্রিমো কন্টি ষ্টুডিওতে কাজ করেন কিছুদিন। তারপর প্যারিসে যান এবং এক বৎসর সেখানে অবস্থান করেন; সেখানে তিনি গ্যামা সামিয়ের ম্যাকাভয়ের স্টুডিয়োতে কাজ করেন। প্যারিসের বিখ্যাত শিল্পী জাদকিনের কাছেই তিনি বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করেন।

এইসব স্থানে কাজ করেই শুধু শ্রীমতী সেন ক্ষান্ত হননি, পরম উৎসাহে তিনি পরিদর্শন করেছেন এখানকার আর্ট-

শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা জনৈকা রমণী।

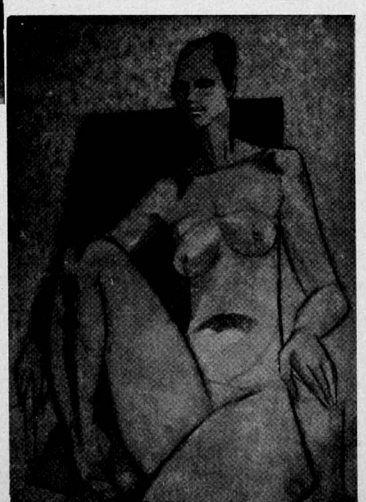

ন্যুড্ বা বিবসনা নারীর চিত্র।

গ্যালারি ও আর্ট মিউজিয়ামগুলো। ১৯৫৪ সালে তিনি কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে পার্ক স্ট্রীটের আর্টিষ্ট্রি হাউসে তাঁর নিত্যনতুন অভিজ্ঞতাপ্রসূত ছবিগুলো প্রদর্শিত হয়, এবং তিনি প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন এই চিত্রপ্রদর্শনীতে। বিভিন্ন সংবাদ-পত্রগুলো সমগ্র ভারতবর্ষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেয় চিত্রশিল্পী হৈমন্তী সেনের পরিচয়।

শ্রীমতী সেন চিত্রপ্রদর্শনীর প্রতিনিধিরূপে চেকো-শ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশগুলোতে পরিভ্রমণ করেন। এইসব জায়গার শিল্পচেতনা তিনি প্রত্যক্ষ করেন এবং অনুশীলনও করেন।

বিদেশে ভ্রমণকালে হৈমন্তী সেন সেজান, পিকাসো,

একটি গ্রীষ্মকালীন দ্বিপ্রহরে।

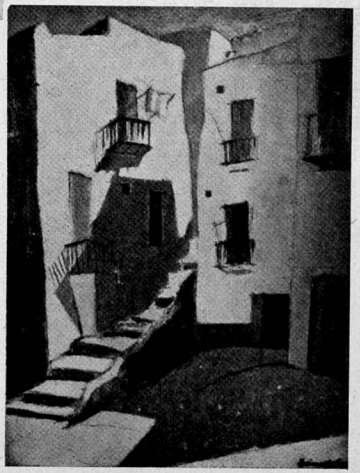

স্পেন দেশে বারান্দার বাহার।

ব্রাক, মদিগলিয়ান প্রভৃতি পাশ্চাত্য শ্রুতকীর্তি চিত্রশিল্পীদের কাজ দেখার সুযোগ পান এবং তাঁদের ছবি থেকে প্রচুর অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ যেমন শিল্পীর মন তেমনি বর্ণ-বৈচিত্র্যের সূক্ষ্ম শিল্পচেতনা তাঁর অপূর্ব। ড্রইং-এর দিকেও তিনি দেখিয়েছেন শক্তিশালী একটি নতুন দিক। শ্রীমতী সেনের চিত্রাঙ্কনের ধরন (টেকনিক) বলা যায়, ইম্প্রেশনিজম এবং কিউবিজমের মাঝামাঝি। হৈমন্তী সেন তাঁর চিত্রাঙ্কনে প্রশংসনীয় মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং অঙ্কনের ধরনে পাশ্চাত্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত হোলেও তিনি ভারতীয় ভাবধারাকে মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেননি। সশ্রদ্ধ ও বিমুগ্ধচিত্তে অনুপ্রাণিত হোয়েছেন ভারতীয় শিল্প-সাধনার চিরন্তন সুরঝংকারে। বলা বাহুল্য, তাঁর শিল্পচর্চায় পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষভাবে প্রকট হোলেও প্রাচ্যের চারুশিল্পের মূল সুর তিনি যতটা উপলব্ধি কোরতে পেরেছেন, পাশ্চাত্যের তা পারেননি। ভারতের শিল্পগুরু

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অত্যন্ত প্রিয় শিল্পী।

বাঙালী তথা ভারতীয় মহিলা শিল্পীদের গতানুগতিকতায় হৈমন্তী সেন যুগান্তর এনেছেন। শিল্প-জীবনে তার অভিনবত্বের তুলনা নেই। এমন আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন এমন অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতাহীন শিল্পসাধনা ভারতীয় মহিলা-শিল্পীদের ইতিহাসে দুর্লভ।

শ্রীমতী সেন জল-রং, তেল-রং, টেম্পারা প্রভৃতি সব রঙের মাধ্যমেই ছবি আঁকেন, তবে তেলরঙের ব্যবহারই তিনি কোরে থাকেন বিশেষভাবে।

হৈমন্তী সেন বর্তমানে প্রাট্ মেমোরিয়াল স্কুলের শিল্প-বিভাগের শিক্ষয়িত্রী। ব্যক্তিগত প্রদর্শনী ছাড়াও আকাদেমির ফাইন আর্টস, ললিতকলা আকাদেমি প্রভৃতি প্রদর্শনীতে তিনি ছবি প্রদর্শিত করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশংসাও অর্জন কোরেছেন প্রচুর। অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় নিজস্ব শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন কোরবেন বোলে তিনি আশা করেন।

সেরামিকস্-এর কাজেও শ্রীমতী সেন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। এতে নিছক ডিজাইনের পরিবর্তে পেন্টিং-এর ধরনে কাজ করার চেষ্টা কোরেছেন এবং অনেকখানি সফলকামও হোয়েছেন বলা চলে। এই বিষয়ে তিনি আরও কিছু কাজ করার ইচ্ছা রাখেন।

শ্রীমতী হৈমন্তী সেন ইতিমধ্যেই একটি সুখপ্রদ প্রশংসনীয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সম্ভাবনা, সংকল্প, আন্তরিকতা, কাজে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা—বিভিন্ন গুণে এই শিল্পীর ব্যক্তিত্ব প্রদীপ্ত। তাঁর কাজে সেই দীপ্ত ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

বর্তমানে শিল্পী নতুন নতুন ভাবনায় অনুপ্রাণিত হোয়ে এগিয়ে চলেছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে। কামনা করি তাঁর সাধু ও অকৃত্রিম প্রচেষ্টা সিদ্ধিকে বরণ করুক।

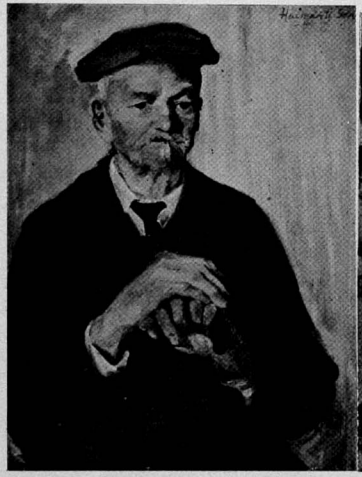

। একটি পোর্ট্রেট বা প্রতিকৃতি।

। প্যারিসের ল্যাটিন অঞ্চল।

খবরাখবর

সারা ভারতে বাঙালী মনীষার যথাযোগ্য সম্মানলাভ যখন এক প্রায়-দুর্লভ ব্যাপার হোয়ে দাঁড়িয়েছে, সে-সময় কোনো বাঙালী মনীষীর সম্মানলাভে আনন্দিত না হোয়ে উপায় নেই। বিশেষ কোরে সে মনীষী যখন হন হুমায়ুন কবির। কবি, প্রাবন্ধিক, কথাশিল্পী, শিক্ষাবিদ্ ইত্যাদি একাধিক পরিচয় যাঁর, সেই সারস্বতজন যখন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, তখন দেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে

আশা পোষণ করা চলে। সম্প্রতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের কেন্দ্রীয় সরকারে যানবাহন ও যোগাযোগ দপ্তরের মন্ত্রিত্ব-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে অধ্যাপক কবিরের মতো সুখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যিক শিক্ষাদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হোলে আমরা আরো খুশি হতাম।

এ প্রসঙ্গে কবির সাহেবের বাংলার সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নিবেদন এই, তিনি যখন যানবাহন বিভাগের ভার পেয়েছেন তখন শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যদি স্বল্পব্যয়ে দেশ-বিদেশে বিমানযোগে যাতায়াতের সুবিধা কোরে দেন তা হোলে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা বিশেষ উপকৃত হবেন। কারণ শিল্পী সাহিত্যিকদের দেশ-দেশান্তর ভ্রমনান্তে তাঁদের সৃষ্টির খোরাক যোগাড় সর্বজনবিদিত। এছাড়া শিল্পী সাহিত্যিকদের আর্থিক অবস্থাও কবির সাহেবের অবিদিত নেই। সেই কারণে তাঁর কাছে এটা আমরা শুধু আশা করি না, দাবীও করি।

সম্প্রতি কোলকাতায় 'হ্যাণ্ডলুম উইক' বা 'হস্তজাত বস্ত্রশিল্প সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হোয়ে গেল। বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটীরশিল্প কখনোই পাল্লা দিতে পারে না। অথচ বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পেরও স্থান থাকা অত্যাবশ্যক। শিল্প-সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান চিরদিনই পুরোভাগে। দেশের ক্রমক্ষীয়মান কারিগর, তাঁতি প্রমুখ হতভাগ্য শিল্পীদের উৎসাহদানের জন্য মাঝে মাঝে যদি এ-ধরনের প্রদর্শনী বা উৎসবের আয়োজন করা হয়, তা হোলে একটা মস্ত বড় কর্তব্য করা হবে। এ-ধরনের 'হ্যাণ্ডলুম উইক' পালনের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও দেশের বিভিন্ন কুটীরশিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

সত্যজিৎ রায় সাম্প্রতিক বাংলা চলচ্চিত্রের একটি ঘটনা। বাংলা চলচ্চিত্রজগতের হাওয়াবদলের জন্য তিনি স্মরণীয় হোয়ে থাকবেন। চলচ্চিত্রে তাঁর মতো প্রতিভাবান চিত্র-শিল্পীর আবির্ভাব হওয়াতে সম্প্রতি আরো দু-একজন চিত্র-শিল্পী চলচ্চিত্রে যোগদান কোরেছেন। রাজেন তরফদার ইতিমধ্যেই তাঁর 'অন্তরীক্ষ' নামে চিত্রনির্মাণের কাজ প্রায় শেষ কোরেছেন। আরো সম্প্রতি খ্যাতনামা প্রচারশিল্পী ও, সি, (গাঙ্গুলী) চিত্রনির্মাণের কাজে এগিয়ে এসেছেন। সন্তোষ কুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' নামে বিখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপ দিচ্ছেন ও, সি। আগামী মাসেই চিত্র-নির্মাণের কাজ সুরু হবে বোলে শোনা যাচ্ছে। আলোক চিত্রের ভার গ্রহণ কোরেছেন শ্রীরামানন্দ সেনগুপ্ত।

এ-ধরনের তরুণ চিত্রশিল্পীদের চলচ্চিত্রে যোগদানে দু-একটি চালু পত্রিকার সিনেমা-সম্পাদক ও সমালোচকরা কথঞ্চিৎ ত্রস্ত ও সন্দিগ্ধ হোয়ে উঠলেও আমাদের আশা ও, সি,-র মতো সুদক্ষ চিত্রী চলচ্চিত্রেও তাঁর বন্ধু ও পূর্বসূরী সত্যজিৎ রায়ের মতোই স্বীয় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হবেন।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় সম্প্রতি দিল্লীর লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হোয়েছেন। বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনি একজন বিশিষ্ট পুরুষ। এবার তিনি রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ কোরতে চললেন। এবং রাজনীতিতেও তিনি তাঁর কর্মতৎপরতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন আশা রাখছি। সুবক্তা হিসাবে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ। যেখানে তাঁর আগামী রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহের বিস্তার, সেই কেন্দ্রীয় সংসদে বক্তৃতা ইত্যাদি অনেকখানি কার্যকরী। বাংলাদেশের তরফ থেকে তিনি যাচ্ছেন। সুতরাং সর্বাগ্রে এবং সব সময় বাংলাদেশকে মনে রেখে মুখ্যত বাঙালীদের স্বার্থসংরক্ষক ও বাংলাদেশের প্রবক্তা হিসাবে নিজেকে সংসদে প্রতিষ্ঠিত কোরবেন, তাঁর কাছে আমাদের এই দাবী রইলো।

আজ আর কোথাও না হোক, সংস্কৃতিজগতে অন্তত বাংলা আজ যা ভাবে, ভারতবর্ষ তা কাল ভাবে। বাঙালী এখনো যা করে বা করবার ক্ষমতা রাখে অন্যান্য ভারতীয়দের পক্ষে তা অভাবনীয়। চলচ্চিত্রজগতে পর পর দু বছর শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ কোরে বাঙালীরা এইটাই প্রমাণ কোরলো যে, জাত-ছবি তৈরী করার ক্ষমতা বাঙালীদেরই। প্রচুর অর্থ ও শিল্পপ্রকরণগত সুবিধা না পেয়েও চলচ্চিত্রে

বাঙালীরা যে ছবি বিশ্বজনকে উপকার দিয়েছে ও দিচ্ছে তার তুল্য ছবি অ-বাঙ্গালীরা কটা কোরতে পেরেছে? ১৯৫৫ সালের সেরা ছবি হিসাবে 'পথের পাঁচালী' ও ১৯৫৬ সালের সেরা ছবি হিসাবে 'কাবুলিওয়ালা' শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছে। 'কাবুলিওয়ালা' চিত্রের শিল্পী ও কলা-কুশলীবৃন্দ এবং প্রযোজক শ্রীঅসিত চৌধুরীকে এজন্য আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য, শ্রীচৌধুরী গত বৎসরও 'ছেলে কার' নামক চিত্র প্রযোজনার জন্য পুরস্কৃত হোয়েছিলেন। এ বছর বাংলা থেকে 'একদিন রাত্রে' ও 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' নামে আরো দুটি ছবি পুরস্কার পেয়েছে। এমন 'বন্ধন' নামে হিন্দী যে ছবিটিও মানপত্র পেয়েছে তার প্রযোজক ও পরিচালকও বাঙালী। এই সব ছবির শিল্পী কলাকুশলী এবং প্রযোজকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সম্প্রতি 'সিপাহী বিদ্রোহ শতবার্ষিকী স্মরণোৎব' ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উদ্‌যাপিত হোয়েছে। ভারত সরকার আগামী ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে এ উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ স্মরণোৎসবের আয়োজন কোরছেন। কোলকাতায় গত ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল ও ১লা ও ৩রা মে এশিয়াটিক সোসাইটিতে সিপাহী যুদ্ধের ওপর ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন, ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ও ডক্টর শশিভূষণ চৌধুরী প্রমুখ প্রখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিকবৃন্দ বক্তৃতা প্রদান করেন। এ উপলক্ষে সোসাইটি সিপাহীযুদ্ধ সম্পর্কিত বহু অমূল্য ও দুর্লভ চিত্রাবলী, দলিলপত্র, গ্রন্থ ইত্যাদি সহযোগে একটি উল্লেখযোগ্য ও সবিশেষ প্রশংসনীয় প্রদর্শনীর আয়োজন কোরেছিলেন। এ প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি।

দিকে দিকে বেজে ওঠে শঙ্খ। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনকে কেন্দ্র কোরে দেশের সর্বত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রভারতী, মহাজাতি সদন প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানসমূহ থেকে সুরু কোরে এ-পাড়া সে-পাড়া এ-গলি সে-গলি প্রভৃতি সবখানেই রবীন্দ্র স্মরণোৎসব সুসম্পন্ন হোয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনের মধ্যে দিয়ে বাংলার যে প্রাণস্ফূর্তি লক্ষ করা যায়, তা খুবই আনন্দপ্রদ এবং আমরাও তাঁর জন্মদিনকে কেন্দ্র কোরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহের আবশ্যকতা উপলব্ধি করি। কিন্তু যিনি সমগ্র দেশকে বিশ্বের কাছে বরণীয় কোরে তুলেছিলেন তাঁর স্মৃতিকে বরণ করবার সময় আমরা যেন তাঁকে ছোট না করি, সেই দিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে যিনি সকল রকম জাগতিক পূজা-অর্চনার বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁর জন্মদিনকে আমরা যেন পূজা-পার্বণের তিথিতে পরিণত না করি, রবীন্দ্র-স্মরণকে যেন রবীন্দ্রপূজায় পর্যবসিত না করি। এ কথা বলা হোচ্ছে তার কারণ ক্রমশ রবীন্দ্রপূজার পূর্বাভাস আতঙ্কজনকভাবে তথাকথিত সংস্কৃতি-সন্ধিৎসুদের মধ্যে দেখা দিতে সুরু কোরেছে।

ডকুমেণ্টারী ফিল্মের প্রতিও সাধারণ লোকের এখন আগ্রহ দেখা দিচ্ছে। এবং ভালো ডকুমেণ্টারী ফিল্মও যে এমনি ফিল্মের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সম্প্রতি বিখ্যাত শিল্পপ্রতিষ্ঠান টাটা কোম্পানী একটি ডকুমেণ্টারী ফিল্ম তুলতে অগ্রণী হোয়েছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে ফ্রান্স থেকে বিখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী ক্লদ রেনোয়াকে আমন্ত্রণ কোরে এনেছেন। ছবির কাজ অনেকদূর অগ্রসর হোয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য অবলম্বনে এই ছবিটি পরিচালনা কোরছেন শ্রীহরিসাধন দাশগুপ্ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়মে কিছুদিন আগে একটি আসন ও সতরঞ্চির প্রদর্শনী হোয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের রমণীয় সতরঞ্চি ও আসনের সমাবেশে প্রদর্শনীটি বেশ আকর্ষণীয় হোয়েছিল। এ ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করাতে আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয়পুরের নানাবিধ শিল্পসম্ভারের সমাবেশে সম্প্রতি আর্ট-ইন-ইণ্ডাস্ট্রি ভবনে একটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হোয়েছিল। শিল্পরাজ্য হিসাবে জয়পুরের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু কলারসিকরা তার একটি বাস্তব ও সুন্দর প্রমাণ পাবার

সুযোগ পেয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। এই জাতীয় একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসার্হ প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য এর অন্যতম উদ্যোক্তা সুখ্যাত শিল্পরসিক ও শিল্পীদরদী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অজিত মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর যে ভাবে দেশিয় হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প ও বয়নশিল্প ইত্যাদি জনগণের সামনে বারংবার তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন—তাতে তাঁদের এইরূপ প্রচার-প্রচেষ্টার প্রশংসা না করে পারা যায় না।

এই কয় মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে হস্তশিল্প, বয়নশিল্প ও কুটিরশিল্প ইত্যাদির একাধিক প্রদর্শনীই তার প্রমান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যে কয়েকটি প্রদর্শনী হয়েছিল তন্মধ্যে বাঁকুড়ার হস্তশিল্প প্রদর্শনীই নানা দিক দিয়ে আমাদের মতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীটি সুন্দরম্ প্রকাশনের প্রায় শেষ সময় অনুষ্ঠিত হওয়ায় এ সংখ্যায় বিশেষ কিছু আলোচনা করা গেল না। আমরা এই প্রদর্শনীটি সম্পর্কে বিষদভাবে আগামী সংখ্যায় আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি।

ভারত-গৌরব শিল্পী যামিনী রায়

আজ অসুস্থ। সুন্দরম্-এর তরফ থেকে

আমরা সবাই তাঁর আরোগ্য কামনা করি

The Statement in compliance with Rule 8 of the Registration of News-papers (Central) Rules, 1956.

about SUNDARAM

FORM IV

1.	Place of Publication	54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13
2.	Periodicity of its Publication	Monthly
3.	Printer's Name	Subho Tagore
	Nationality	Indian
	Address	54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13
4.	Publisher's Name	Subho Tagore
	Nationality	Indian
	Address	54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13
5.	Editor's Name	Subho Tagore
	Nationality	Indian
	Address	54, Ganesh Chandra Avenue, Calcntta-13
6.	Names and addresses of individuals who own the News-Paper and partners or shareholders holding more than one per cent of total Capital	Subho Tagore, Sole Propritor

I, Subho Tagore, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

SUBHO TAGORE

Signature of Publisher

Printed by Subho Tagore from Art Press of India Private Ltd.—263, Bowbazar Street, Calcutta-12 and Published by him from 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.

INDIAN ART USED IN ADVERTISING

BURMAH-SHELL ●●● IN INDIA'S LIFE AND PART OF IT

INDIAN ART USED IN ADVERTISING

BURMAH-SHELL ●●● IN INDIA'S LIFE AND PART OF IT